শনিবারের চিঠি

২১ পৌষ ১৩৯১ □ ৫ জানুয়ারি ১৯৮৫.

সত্যজিত রায়
ঘরে বাইরে

বাইরে উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রায়িত করার বাসনা সত্যজিতের
ালের। নানা কারণে কাজটিতে হাত দিলেন প্রৌঢ়ত্বে পৌছে।
নাথের মেজাজ ও উনিশ শতক-কে স্বকীয়ভাবে উপলব্ধির
তিনি ইতিপূর্বে রেখেছেন। 'ঘরে বাইরে' তাঁর শৈল্পিক উপলব্ধির
কতখানি ধরে রাখতে পারবে সে বিষয়ে এক জোরদার বিতর্ক
রয়েছে। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী সেই বিতর্ককে ঘিরে।

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

* রচনাবলী – মানিক গ্রন্থাবলী (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত)।। বনফুল রচনাবলী (১৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (৯ খণ্ড প্রকাশিত)।। অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (১০ খণ্ড প্রকাশিত)।। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৪ খণ্ড প্রকাশিত)।। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (২ খণ্ড প্রকাশিত)।।
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

* বিশ্বভারতী · রবীন্দ্রভবণের গবেষণা গ্রন্থ–অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত :
রবীন্দ্র-রচনা সংকলন –
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা–২৫ টাকা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা–৩০ টাকা

* রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত।। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়।। ৩০ টাকা
রবীন্দ্র স্মৃতি।। বনফুল।। ১০ টাকা

* অধ্যাপক ডঃ সরোজমোহন মিত্রের–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য।। ৩০ টাকা
সুকান্তের জীবন ও কাব্য।। ১৫ টাকা শরৎসাহিত্যে সমাজচেতনা।। ১৬ টাকা

* উপন্যাস –বনফুল : হাটেবাজারে ৮ টাকা।। গোপালদেবের স্বপ্ন ১০ টাকা।। অধিক লাল ১০ টাকা।। ত্রিনয়ন ৮ টাকা।। গল্পসমগ্র (দুই খণ্ড প্রকাশিত) প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা।। পশ্চাৎপট (আত্মজীবনী) ২৫ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু : বাসর ঘর ১০ টাকা।। লাল মেঘ ১০ টাকা।। কালো হাওয়া ১৫ টাকা।। এলোমেলো জলতরঙ্গ (ছোটদের উপন্যাস) ১০ টাকা।।
–প্রতিভা বসু : জন্মান্তর ১০ টাকা।। যখন বসন্ত ১০ টাকা।। স্মৃতি সততই সুখের।। (আমেরিকা ও ইউরোপের বিচিত্র ভ্রমন কাহিনী–দুই খণ্ডে। প্রতি খণ্ড ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা।।
–জগদীশ গুপ্ত : লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ ১০ টাকা।।
–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার ১২ টাকা।।
–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জনপদবধূ ১২ টাকা।। কর্ণটিরাগ ৮ টাকা।। নগরনন্দিনীর রূপকথা ১০ টাকা।।
–নিরঞ্জন চক্রবর্তী : খেলাঘরের যাত্রী ৮ টাকা।। প্রতিবিম্বের স্বাদ ৮ টাকা।।

* কবিতা –অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : উত্তরায়ণ ১০ টাকা।। নীল আকাশ ৮ টাকা।। পূব পশ্চিম ৮ টাকা।। আজন্ম সুরভী ৮ টাকা।।
–বুদ্ধদেব বসু : শীতের প্রার্থনা–বসন্তের উত্তর ১০ টাকা।। যে আঁধার আলোর অধিক ৮ টাকা।। মরচে পড়া পেরেকের গান ৮ টাকা।।
–জীবনানন্দ দাস : আলো পৃথিবী ১০ টাকা।।
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমগ্র কবিতা ১০ টাকা।।

গ্রন্থালয় প্রা. লি. – ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট।। কলিকাতা-৭৩

নামবুদিরিপাদ মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হবার নেপথ্য কাহিনী। শংকর ঘোষের বিশেষ প্রতিবেদন।

আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষ : তিন গণতন্ত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? অরুণ বাগচীর প্রবন্ধ।

জ্যোতিবাবু বলেছেন, জীবিত ইন্দিরার চেয়ে মৃত ইন্দিরার প্রভাব বেশি। পরেশ সাহা দেখিয়েছেন, বাংলাদেশও এখন শাসন করছেন একজন মৃতব্যক্তি।

কলকাতার খালিস্তানপন্থীরা কি করছেন? এস এস মান কি মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন? আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি এবং বিশ্বজিৎ রায়ের প্রতিবেদন।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □
মরজি মহল □ বনফুল
নূপুরের মতো □ অনুলিখন অনুপমা দাশ
'একই সংগে তো আর সব কাজ করা যায় না' – সত্যজিৎ রায় □ সাক্ষাৎকার সত্যজিৎ দাশগুপ্ত
ঘরে বাইরে বিতর্কের পূর্বাভাস □ বীরেন্দ্র দাস শর্মা
বহুমুখী সত্যজিৎ □ দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়
বিদেশী সমালোচকদের চোখে ঘরে বাইরে □
দিল্লীর পরিবহন □ অমিত রায়
নির্বাচনী জমা-খরচ □ নিজস্ব প্রতিনিধি
এক মৃতব্যক্তি বাংলাদেশ শাসন করছেন □ পরেশ সাহা
দ্য সুনার ইউ অ্যান্ড দ্য বেটার □ শংকর ঘোষ
গণতন্ত্রের সেই শিকড়ে □ অরুণ বাগচী
খালিস্তান পন্থীদের সংগে কলকাতার শিখনেতার যোগাযোগ □ বিশ্বজিৎ রায়
রাইটার্সে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে মান □ বিশেষ প্রতিনিধি
নির্বাচনের অন্য গল্প □ শুভাশিস মৈত্র

সংবাদ-বিসংবাদ □
সংবাদ-সাহিত্য □
প্রচ্ছদ অলংকরণ □ প্রদোষ কান্তি বর্মণ
প্রচ্ছদের ছবি □ অনীল বরণ
অন্যান্য ছবি □ নিমাই ঘোষ, জয়ন্ত চৌধুরী, প্রবীর দাস, রুবীর আইচ, শুভম দত্ত।
কার্টুন □ অমল চক্রবর্তী

শনিবারের চিঠি

(প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

(নব পর্যায়। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সম্পাদক: চিরন্তন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: সাহিত্য ● রঞ্জনকুমার দাস; সংবাদ ● অজিত চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপক: অরুণাংশু ঘোষ
প্রধান কর্মসচিব: শ্যামলী মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক: রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: আশিস মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ: শহীদুল ইসলাম

বনফুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে চিরন্তন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কম্প্যু কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড ৯৬ রাজা রামমোহন সরণি কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত।

কার্যালয় ৩২, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন ২৭-৪৯৪৩

দিল্লি অফিস সুনীল ভবন সি ১/১০১-১০২ লাজপত নগর নয়া দিল্লি-১১০০২৪ ফোন: ৬১৭৬৭১

ত্রিপুরা প্রতিনিধি: গোপাল বসু

এবার তোরা হেগড়ে হ

যাঁরা রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়েছেন, তাঁরা, এবং তাঁদের নেতারাও, মানুষ কিন্তু মহাপ্রাণ রামকৃষ্ণ হেগড়ের মত মানুষ নন। যদি হতেন, অনেক হেনস্থার হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন। রাজনীতির, বিশেষ করে বাম রাজনীতির মুল্লুকে কেউ কখনও পদত্যাগ করেন না। পদচ্যুত করার পরম দায়িত্ব সেখানে পরমেশ্বরের উপর উৎসর্গীকৃত। তাই সকল দলেই বাহাত্তুরেদেরই ভিড়।

ষাট বছরে পা পড়তেই নানাজি দেশমুখ রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। তাঁর নিজের দলও কাজটি ভাল চোখে দেখেননি। লোকসভার নির্বাচনে দলের ভরাডুবি হেগড়ের বিবেক বিচলিত হয়ে পড়ে। জনগণের সমর্থন নেই, তাই তিনি পদত্যাগ করেন। স্বর্গত পিতা রামকৃষ্ণ নাম রাখাতেই হয় তো এই মতিভ্রম। দেশবাসী এজন্য তাঁকে তারিফ করলে কি হবে। একদা পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী নামবুদিরিপাদ তো রীতিমত হুংকারই ছেড়েছেন।

এ রাজ্যের রাজনৈতিক নেতারা যদি হেগড়েকে অনুসরণ করেন, রীতিমত একটা বিপ্লব ঘটে যেত। রাইটার্সে জ্যোতিবাবু থাকতেন না, আলিমুদ্দিনে সরোজ মুখার্জি অথবা হাজি মহসিন রোডে আনন্দগোপাল – গোপালদাসদের পিছনের সারিতে হটে যেতে হত, ফরোয়ার্ড ব্লক অশোক ঘোষ – চিত্ত বসু আর আর এস পির ত্রিদিব চৌধুরী – মাখন পাল জুটির হাত থেকে তাঁদের দল অব্যাহতি পেত।

কিন্তু সে গুড়ে বালি। বয়েস আর ব্যর্থতা কখনই নেতাদের নড়াতে পারে না। উপর তলার হুকুম কিংবা পরমেশ্বরই এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোকে অথর্ব, অক্ষম, ব্যর্থ পরম বৃদ্ধদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। তাঁরা রামকৃষ্ণ ভক্ত না হতে পারেন, কিন্তু হেগড়েকে বাদ দেবেন কি করে?

জয়যাত্রা সহজ হোক

জনগণের রায়ের আলোকে উদভাসিত নতুন রাজীবের সঙ্গে পুরাতন রাজীবের কোন মিল আছে কি? জনগণ যাঁহাকে বলা যাইতে পারে ভারত ভাগ্য বিধাতার আসনে বসাইয়াছে, যাঁহাকে সকলে জনগণ ঐক্য বিধায়ক হিসাবে দেখিতে চাহে তাঁহার নিকট আমাদের প্রত্যাশার শেষ নাই। এই পীড়িত মূর্ছিত দেশ তাঁহাকে জনগণ দুঃখ-ত্রাতা হিসাবে পাইতে চাহে।

গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ-বিন্ধ্য-হিমাচল জয়গাথা গাহিতেছে, আমরা চাই তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীস্টান – সকল মন জয় করুন। ভোটযুদ্ধ শেষে রাজীবকে চাই সকল সঙ্কট দুঃখত্রাতা হিসাবে। তিনি দুঃস্বপ্ন আতঙ্ক হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত করুন। যাঁহার স্নেহময়ী মাতাকে দেশ হারাইয়াছে, তিনি আমাদের নতুন সারথি। তাঁহার সহিত পুরাতন রাজীবের মিল কোথায়?

নির্বাচনে বিরোধী পক্ষ মুছিয়া গিয়াছে। রাজীবের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু রাজীব শুধু সরকার পক্ষের নন, বিরোধী পক্ষেরও প্রধানমন্ত্রী। তাই আমরা চাহিব দৈন্যজীর্ণ নিরাশাতামসদীর্ণ বিরোধীপক্ষকে তিনি বন্ধুভাবে লউন। সর্বদলীয় বৈঠক ডাকিয়া রাজীব সেই আশ্বাসই দিয়াছেন। আমরা চাহিব, তাঁহার জয়যাত্রা সহজ হউক। নতুন নেতৃত্বে দেশ আগাইয়া চলুক।

গণতন্ত্রের সেই শিকড়ে

অরুণ বাগচী

এই দেশের ষোলটি রাজ্য ও ছয়টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সাড়ে সাতাশ কোটি নাগরিক তাঁদের সংবিধানদত্ত ভোটের পবিত্র অধিকার প্রয়োগ করলেন। দুকোটি মানুষ জীবনে এই প্রথমবার ভোট দেবার সুযোগ পেয়েছেন। কারণ ১৯৮০ সালের নির্বাচনের সময় এঁরা একুশ বছরে পৌঁছননি, ফলে আইনানুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য হয়ে ভোট দেবার অধিকারীও হননি। দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে যে বিরাট আয়োজন চলেছে তাকে বলা চলে এক মহৎ যজ্ঞ। ২৪ ডিসেম্বর ভারতের পক্ষে ছিল মস্ত গর্বের দিন। কারণ এত বড় একটা দেশে যত কোটি মানুষ ততকোটি সমস্যা, তৎসত্ত্বেও গণতন্ত্রের কঠিন সাধনার পথ থেকে ভারত সরে আসেনি। চতুর্দিকে একটির পর একটি দেশে যখন গণতন্ত্রের যত মিনার যত মঞ্চ ভেঙেগ ভেঙেগ পড়েছে, প্রশাসন ও ক্ষমতা সবলে দখল করে নিয়েছে স্বৈরতন্ত্র, তখন অবিরাম ঝড়ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছে ব্যক্তি স্বাধীন ও প্রজাতন্ত্রী ভারত।

নিছক বা নিরর্থক অহঙ্কার এটা নয়। পৃথিবীতে গণতন্ত্রের বিচারে তিনটি দেশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত। সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে যা আমরা বুঝি তার জন্মস্থল হল ব্রিটেন। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টকে বলা হয় মাদার অব পার্লিয়ামেন্টস--পৃথিবীর যে সব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু, তাদের অধিকাংশই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে ওদেশের গণতন্ত্রী প্রথা। তারপর ইতিহাস বা ভূগোলের শাসনে কিছু পরিবর্তন এনেছে। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সব জাতির আশা আকাঙ্খার, রীতিনীতির, ভাবনাচিন্তার, প্রবণতার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে, থাকতেই পারে, থাকবেও। কাজেই পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে এবং চাপে পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু মূল প্রেরণা কোথা থেকে সে বিষয়ে সংশয় নেই।

ব্রিটেনে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত পার্লিয়ামেন্টের উপর। আরও [illegible] করে বলা যেতে পারে হাউস অব কমন্সের উপর, যার সদস্যরা সব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। মাথার উপর হাউস অব লর্ডস আছেন, কিন্তু তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। কমন্স সভায় গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে লর্ডস

স্বাধীনতার পর বারবার গণতন্ত্রকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং সে পরীক্ষার ফলাফল অতিশয় সন্তোষজনক। এত দারিদ্র্য, এত নিরক্ষরতা, এত সমস্যা, এত ভাষা, এত রাজনৈতিক দল (ব্রিটেন বা আমেরিকার মত মূলত দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়)--তবুও ভারতীয় গণতন্ত্র এখনও অটুট। জওহরলাল নেহরুর আমলেই কেরালা বামপন্থী সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, তামিল ও তেলুগু ভাষাভাষী অঞ্চলে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছে। ১৯৭৭ সালে স-সন্তান ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। দলবলসহ ওই দরিদ্র নিরক্ষর ভোটদাতারা আবার ১৯৮০ সালে সেই ইন্দিরাকেই বিপুল গরিষ্ঠতা দিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছেন, অনেকের কাছে যা মিরাকল, গরিব ভারতীয় জনগণ অনায়াসে নিঃশব্দে সেই কাণ্ডটি করে দিয়েছেন, এই একটি ঘটনাই অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ এবং নিঃসংশয়ে এটাই প্রমাণিত যে গণতন্ত্রের আসল চাহিদা হল সতেজ স্বাধীনচিত্ত মাটির কাছাকাছি বাস করা একদল মানুষের। এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত বিপুল বিত্তশালী আমেরিকা বা ব্রিটেন অন্যান্য নানা সুবিধে সত্ত্বেও ভারতের মত ভাগ্যবান নয়।

সভা আপত্তি তুলতে পারেন, সংশয় প্রকাশ করতে পারেন, একটা সীমা পর্যন্ত বাধা দিতে পারেন। তার বেশি কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত কমন্সের ইচ্ছারই জয় জয়কার ঘটে। অর্থাৎ যথার্থ জনপ্রতিনিধিরা গরিষ্ঠ-সংখ্যায় যা স্থির করবেন, তাই সরকারি নীতি হবে। লর্ডস সভা যা করেন তা হল একটা যতির কাজ। উত্তেজনা বা ভাবাবেগের ফলে যদি কোনও ব্যস্ততা অশোভন আকার ধারণ করে, তাকে রুখে দেবার জন্যই লর্ডস সভা। আরও সহজ কথায়, তরুণদের অপরিণামদর্শী ইচ্ছার মুখে লাগাম পরানোর কাজটি করেন হাউস অব লর্ডস। তাঁরা বলেন, সহসা বিদধীত মা ক্রিয়াম্। আর একবার ভেবে দেখো। অবশ্য পার্লিয়ামেন্টের সরকারের, উপরেও আছেন মনার্ক--রাজমহিমা বিস্তার করে। কিন্তু সিংহাসনের অভিমুখে যতটা শ্রদ্ধা ধাবিত হয়, রাজদণ্ড ঘিরে ততখানি ক্ষমতার বিকীরণ ঘটেনা। আসলে ক্ষীণ হতে হতে ক্ষমতা প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। রাজা বা রাণী পরামর্শ দেন, নির্দেশ দিতে পারেন না। তবে যেহেতু প্রধানমন্ত্রীরা আসেন যান, আর রাজারাণী কয়েক দশক ধরে রাজত্ব করেন, সেহেতু তাঁদের পরামর্শ সাধারণতই মূল্যবান বলে গণ্য হয়। হাজার হলেও অভিজ্ঞতার দাম কিছু কম নয়।

স্বাধীন হবার পর ব্রিটিশ প্রথা থেকে একেবারে বেরিয়ে যাবার মানসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সংবিধান চালু করে তার শীর্ষে রাষ্ট্রপতি, যিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। প্রশাসনে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য উপদেষ্টামণ্ডলীর সবাই রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত, নির্বাচনের প্রসঙ্গ সেখানে ওঠেনা। কিন্তু কংগ্রেসের দুটি অঙ্গ সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেসেন্টেটিভ-এর সদস্যরা নির্বাচিত হন জনগণের ভোটে। কংগ্রেসকে একেবারে উপেক্ষা করে কোনও প্রেসিডেন্টই কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন না, নানা সাংবিধানিক সমস্যায় পড়ে যান। আবার কংগ্রেস যত বিরূপই হোন, প্রেসিডেন্টকে বিব্রত করার ক্ষমতা তাঁরা রাখেন, কিন্তু একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রেসিডেন্টকে পুরোপুরি আটকে দেবার শক্তি কারও নেই। কারণ

প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত ব্যক্তি, ভোটদাতাদের আশীর্বাদধন্য । জনপ্রিয় কোনও প্রেসিডেন্টকে অকারণে বাধা দেওয়া বা বিপন্ন করার বিপদও আছে, কারণ সিনেট বা হাউসের সভ্যকেও জনতার সমর্থনের ভরসায় থাকতে হয়।

স্বাধীন ভারতে একজন প্রেসিডেন্ট আছেন যিনি কার্যত দেশের প্রথম নাগরিক। কিন্তু তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের মত প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রশাসনকর্তা নন, তাঁর মত বিপুল ক্ষমতার অধিকারীও নন। আবার ব্রিটেনের রাজারাণীর মত একেবারেই কাগজেপত্রে বা প্রথার বলে প্রধান নন। লোকসভায় গরিষ্ঠসংখ্যক আসনের অধিকারী দলের যে সরকার গঠিত হয়, তার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীই আসলে প্রশাসনের এক নম্বর ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী (বা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতিকে চলতে হয়। তবে পরামর্শ দেওয়া বা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলার অধিকার তাঁর আছে। তদুপরি জরুরী অবস্থা বা সাংবিধানিক সংকট দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি বিশেষ কিছু ক্ষমতার অধিকারী হন। সেই জরুরীকালীন ক্ষমতার পরিমাপ কম নয়।

যাইহোক, তিনটি দেশেই মূল রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে, কারণ দেশ শাসন কে বা কারা করবেন সেটা ঠিক করে দেন জনগণ। যে কোনও গণতন্ত্রে তাই ঘটবার কথা সেই নির্বাচনে ভুল হতে পারে, অনেক সময় হয়। কিন্তু সেজন্য গণতন্ত্রের নীতি ভ্রষ্ট হয় না, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। মুখে জনগণের দোহাই পেড়ে তাদেরই ঘাড়ে সব বোঝা চাপিয়ে দেবার অভ্যাস পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত, যে সব দেশ নিজেদের গণতন্ত্রী বলে দাবি করেন। কিন্তু অবাধ ও নীতিনিষ্ঠ নির্বাচন যেদেশে হয় সেখানে জনগণই আসল কর্তা। কারণ কিছুদিন বাদে বাদেই তাদের কাছে যেতে হয় মন্ত্রী এবং নেতাদের। তাদের সমর্থন না পেলে অস্তিত্বরক্ষাই অসম্ভব।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস যাঁরা পর্যালোচনা করেন তাঁদের কাছে পরম বিস্ময় হল এদেশে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র। অন্যরকমটা হলে বিস্ময়ের কারণ ঘটত না। ভারত গরিব দেশ, বহু বিষয়ে অনগ্রসর। বিশাল তার জনসংখ্যা, জটিল সব সমস্যার দ্রুত সমাধানের পক্ষে যা পরম বাধা। তাছাড়া যে দেশে শিক্ষার হার এত কম সেদেশে সমস্ত সমাজকে নিয়ে ত্বরিত অগ্রগতি প্রায় অসম্ভব। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এই প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায় যে সেই ভারতে যথার্থ গণতন্ত্র কী করে সম্ভব যে দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা এত বেশি? এর উত্তরে যদি বলা যায় ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশেষ মহিমা ওইখানেই, নিরক্ষরতার ওই বিপুল হার সত্ত্বেও ভারতে গণতন্ত্র সজীব ও সার্থক, তবে সেক্ষেত্রে বৃথা অহঙ্কার প্রকাশ করা হবে না। আমাদের স্বাধীনতার পর বার বার গণতন্ত্রকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং সে পরীক্ষার ফলাফল অতিশয় সন্তোষজনক। এত দারিদ্র্য, এত নিরক্ষরতা, এত সমস্যা, এত ভাষা, এত রাজনৈতিক দল (ব্রিটেন বা আমেরিকার মত মূলত দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়)--তবুও ভারতীয় গণতন্ত্র এখনও অটুট। জওহরলাল নেহরুর আমলেই কেরালা বামপন্থী সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, তামিল ও তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছে। ১৯৭৭ সালে স-সন্তান ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন দলবল সহ ওই দরিদ্র নিরক্ষর ভোটদাতারা। আবার ১৯৮০ সালে সেই ইন্দিরাকেই বিপুল গরিষ্ঠতা দিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছেন। অনেকের কাছে যা মিরাকল, গরিব ভারতীয় জনগণ অনায়াসে নিঃশব্দে সেই কাণ্ডটি করে দিয়েছেন। এই একটি ঘটনাই অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ এবং নিঃসংশয়ে এটাই প্রমাণিত যে গণতন্ত্রে আসল চাহিদা হল সতেজ স্বাধীনচিত্ত মাটির কাছাকাছি বাস করা একদল মানুষের। এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত বিপুল বিত্তশালী আমেরিকা বা ব্রিটেন অন্যান্য নানা সুবিধে সত্ত্বেও ভারতের মত অত ভাগ্যবান নয়।

গণতন্ত্রী আদর্শ কোনও দেশে রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা স্থির করবার একটি বড় উপায় হল পরীক্ষা করে দেখা সেই দেশে গণমাধ্যম সত্যই কতটা মুক্ত, অর্থাৎ সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। গণমাধ্যম যেমন জনগণের, তেমনই সরকারের চোখ বা কানের কাজ করবে, সেটাই হল গণতন্ত্রের পক্ষে প্রার্থিত। সরকার যদি সেটাকে আপন কণ্ঠস্বরের কাজে নিয়োগ করে তবে সমূহ ক্ষতি। আমেরিকায় বা ব্রিটেনে, অথবা ফ্রান্স সহ পৃথিবীর নানা দেশে সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা ভোগ করে। আমেরিকায় তো জনগণের বিপুল সমর্থনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এক প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করে সরেই যেতে হল সংবাদপত্রের চাপে। গণতন্ত্রের পক্ষে এটা সুস্থ লক্ষণ।

সুখের বিষয় এই ঃ একটি দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে সংবাদপত্র বিরাট স্বাধীনতা ভোগ করে। সরকারের অন্ধ স্তাবকতা করে এদেশে কোনও সংবাদপত্রই জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয় না। প্রচার সংখ্যার দিক থেকে অগ্রগণ্য কাগজগুলির দিকে তাকালেই এই সত্য নির্ভুলভাবে ধরা পড়বে। জনগণের পক্ষে এই ব্যাপারটা মস্ত গৌরবের। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণত শাসকশ্রেণী সহনশীলতারই পরিচয় দিয়ে এসেছেন। জরুরীকালীন বিধিনিষেধ, সেন্সরশিপ প্রবর্তন কিছু দিনের জন্য, এছাড়া এদেশে সংবাদপত্রের বড় একটা বাধা পেতে হয়নি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও গণতান্ত্রিক নিষ্ঠার সুফল সংবাদপত্রগুলি এতবছর ধরে পেয়ে আসছে। সেই সুফল বর্তেছে সমগ্র দেশের গণতন্ত্রী আন্দোলনের পীঠভূমিতে। □

খালিস্তান পন্থীদের সঙ্গে কলকাতার শিখনেতার যোগাযোগ

বিশ্বজিৎ রায়

শিখ উগ্রপন্থীদের অন্যতম মগজ এস. এস. মানের সঙ্গে এ রাজ্যের শিখ কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি কমিস্কার সিং ধরা পড়ায় এখানকার শিখরা নতুন এক বিড়ম্বনায় পড়েছেন। 'আজ সে আমাদের সবার মাথা হেট করে দিয়েছে' বললেন কমিটির সম্পাদক, বচনসিং সরল। মাত্র কদিন্ আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শান্তিমিছিলের প্রথম সারিত হাঁটার সুবাদে রাজ্যের শিখদের নেতার মর্যাদা পেয়েছিলেন তিনি। মানের সঙ্গে তার ধরা পড়ার ব্যাপারটি নেহাৎ কাকতালিয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উল্লেখযোগ্য কলকাতায় বিগত শিখ সম্মেলনে প্রকাশ্যে ভিন্দ্রানওয়ালে, মেজর জেনারেল সুবেগ সিং এবং ভাই অমুক সিংয়ের তৈলচিত্র ঝুলিয়ে শহীদ স্মরণের পরিকল্পনাটি ছিল তাঁরই। কোঅর্ডিনেশ-নের অন্যান্য নেতারা এখন গোটা দায়টাই কমিস্কারের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। কিন্তু তখন সেটা তাঁরা মেনেনিয়েছিলেন। সেন্টিমেন্টের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। অথচ বছরখানেক আগেও রাজ্যের শিখ রাজনীতির উঁচু চেয়ারগুলো থেকে কমিস্কার ছিলেন অনেক দূরে। অন্যান্য গুণের তুলনায় কব্জি ও পিস্তলের জোরেই লোকে তাঁকে সমীহ করে। স্বাচ্ছন্দজ্ঞান-সম্পন্ন এই ট্রাকব্যবসায়ীকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কেউই জানত না।

স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযানের কয়েকদিন পরেই কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রস্তুতি সভায় কিছু লোক্ তাঁর নাম প্রস্তাব করে এবং সরলের ভাষায়, 'তাঁকে সভাপতি বানিয়ে দেয়'। বলা বাহুল্য ব্যাপারটা এত সরল নয়। বড়বাজার গুরুদোয়ারার সভাপতি হিসাবে কমিস্কার বেশ প্রভাবশালী তার উপর গুরুদোয়ারার ক্ষমতা দখলের লড়াইতে তাঁর রেকর্ড যেকোন বিরোধী সর্দারের মুখ বন্ধ করাতে যথেষ্ট। বছর দশ-পনেরো আগে কলকাতায় সুরজিৎ সিং গুপ তথা বদনীওয়ালা গ্রুপের সঙ্গে মেহের সিং গরিব গ্রুপের কিসসা কুসীকায় কমিস্কারের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বড়বাজার ও বাগমারি গুরু দোয়ারার দখল ছিল সুরজিৎ সিং ওরফে সীতো নামে এক ম্যাসল্ম্যানের হাতে। মেহের সিং বা দ্রাক্ষা গ্রুপের হাত থেকে রাসবিহারী ও ভবানীপুর গুরুদোয়ারা ছিনিয়ে নেবার জন্যে যে লড়াই শুরু হয় তার পরিণামে উভয়পক্ষে অন্ততঃ দশজন খুন। সুরজিৎ সিং খুন হওয়ার পর বদনীওয়ালা গ্রুপের নেতৃত্ব আসে ইকবাল সিংয়ের হাতে। পার্ক হোটেলের মালিক আমীব চাঁদ প্যারেলালের ওয়ার্কসম্যানেজার এই ইকবালের দল হরদয়াল সিং দীক্ষাও মেহের সিং গরিবের ভাইদের হত্যা করে। বদলা হিসাবে তার দুই চেলা ধনবন্ত সিং এবং জাগীর সিং চিড়িয়াখানার সামনে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তবে 'জয়েন্ট কিলার' হিসাবে কমিস্কারের নাম ছড়িয়ে পড়ে যখন হাওড়া স্টেশনে ইকবাল সিং গুলিবন্ধ হয়ে মারা যায়। ওয়াকিবহাল মহলের দৃঢ় বিশ্বাস কমিস্কারই তাকে মেরেছিল। আগে সে ইকবালের সঙ্গে ছিল কিন্তু কোন একটি কেসে জড়িয়ে পড়ার পর দাক্ষা গ্রুপ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসায় সেই টিমেই তিনি খেলতে থাকেন। কমিস্কারের বিরুদ্ধে চোরাকারবারও জালিয়াতির অভিযোগও উঠেছে। ট্রাক অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি থাকাকালীন টেরিটিবাজারে তাঁর অফিসবাড়ীর 'পজিশন' অ্যাসোশিয়েসনের নামে লিখে দেবেন। এই কড়ারে ৪ লাখ টাকা নিয়ে তা না করায় গোলমাল বাধে। এ নিয়ে স্থানীয় দাদা শেখমুন্নার সঙ্গে বচসার সময় কমিস্কার সিং নিজের পিস্তল থেকে গুলি চালালে কৃষ্ণা সিনেমার সামনে দাঁড়ানো দুজন পথচারী গুলিবিদ্ধ হয়। এদের মধ্যে একজন মারা যায়। এদিকে মুন্নার ছুরিতে ঘায়েল হয়ে সিংজী নিজে যান হাসপাতালে। এখনো সে কেস ঝুলছে। এরকম আরো কিছু ফৌজদারী কেসে তিনি জড়িত।

এহেন লোকের সঙ্গে পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে কিনা এ প্রশ্নে সরাসরি মন্তব্য করতে অস্বীকার করলেও বচ্চন সিংয়ের মনোভাব চাপা থাকেনি। গত কয়েকমাস কলকাতায় শিখদের প্রতিনিধি হিসেবে যা কিছু বক্তব্য রেখেছেন তিনি এবং কমিস্কার। কো-অর্ডিনেশন কমিটি বলতে তাঁদের দুজন এবং মান সিং গারেওয়ালকেই দৌড়ঝাঁপ করতে দেখা গেছে। যদিও কমিস্কার কোথাও তেমন মুখ খোলেন নি। তার অনেক বেশী আগ্রহ ছিল টাকাপয়সা তোলায়। 'ধর্মযুদ্ধ' ঘোষণার পর বিভিন্ন পর্যায়ে জাঠা বা জংগী স্বেচ্ছাসেবকদের পাঞ্জাবে পাঠানোর ব্যাপারে মূল সংগঠকের দায়িত্ব ছিল তাঁর। উল্লেখযোগ্য বিহার রাজ্যপালের প্রাক্তন উপদেষ্টা স্মরণ সিংয়ের মত শিক্ষিত এবং বিবেচক বহু শিখ অপারেশন ব্লুস্টারের পর সরকারের নিন্দায় মুখর হলেও কমিটিতে তাদের কোন ভূমিকা নেই। সি পি এমের সঙ্গে মাখামাখি পছন্দ না হওয়ায় রাজ্য আকালী দলের সভাপতি মেহের সিং গরিব ও তাঁর সংগীরাও চুপচাপই থেকেছেন। এখন কমিস্কার এভাবে ফেঁসে যাওয়ায় বচ্চন সিংদের নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

বিরক্ত ও বিব্রত বচ্চন তাই এই প্রতিবেদকের কাছে বলে ফেলেছেন, 'আকালীদের সঙ্গে এসে আমিই ভুল করেছি'। কমিস্কার যে একাজ করতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেননি। অথচ কিছুদিন আগেই অন্য প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন তাদের দুজনের মধ্যে কোন 'ভুল বোঝাবুঝি' নেই। শুধু তাই নয়, 'কমিস্কার আবার নেতা,' এজাতীয় বক্তব্যও রেখেছিলেন।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে রাজ্যের শ্রী গুরু সিং সভা এবং আকালী দল আলাদা সভা করে খালিস্তান আন্দোলনকে নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব নেয় অবিলম্বে গংগা সিং ধীলন ও জগজিৎ সিং চৌহানকে তনখাইয়া ঘোষণা করা হোক। আকালী দলের মিটিংয়ে বচ্চন সিং ছিলেন প্রস্তাবকদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু বহু শিখ অভিযোগ তুলেছেন এই দাবিটা কমিস্কার গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তোলা হলো না কেন? তাঁদের 'অভিযোগ' গুরুদোয়ারা কেন্দ্রিক কিছু নেতার ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে রাজ্যের শিখসম্প্রদায়কে আবার বিড়ম্বনায় ফেলা হচ্ছে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, দাংগার পর শিখরা পাঞ্জাবে ফিরে যাচ্ছেন এই খবর অস্বীকার করে বচ্চন সিং জানান, এটা নেহাৎ গুজব মাত্র। এখানে শিখরা নিরাপদ। □

“দ্য সুনার ইউ অ্যাক্ট দ্য বেটার”

কথাগুলো অজয় ঘোষ ও গোপালন বলেছিলেন নেহরুকে। শংকর ঘোষ এই প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন যে, নামবুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা ইন্দিরা ভাঙেন নি, ভেঙেছিলেন নেহরু, আর তা অজয় ঘোষ ও গোপালনের কথায়।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম্বুদ্রিপাদ ও জ্যোতিবাবু মধ্যপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্তির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই দুই নেতা কোনদিকে ঝুঁকবেন তা নিয়ে সংশয় ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর কারও সঙ্গে তাঁদের ঐক্যমত ছিল না, তাঁরা আলাদা বক্তব্য, আলাদা থিসিস পেশ করেছিলেন। অবশ্য এই দুই নেতার মত ও বিশ্বাসেও পার্থক্য ছিল, তাই এই দুই মধ্যপন্থী নেতা এক থিসিস পেশ না করে দুটি আলাদা থিসিস দিয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট তত্ত্ব অনুসারে মধ্যপন্থা প্রায়শঃ দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের প্রথম ধাপ। পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে জ্যাতিবাবু দক্ষিণপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন প্রমোদবাবু। পার্টিতে জ্যোতি গোষ্ঠী ও প্রমোদ গোষ্ঠীর বিবাদের কথা তো স্বয়ং প্রমোদবাবুই লিখে গেছেন। (এই প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল দেশহিতৈষীর একটি বার্ষিক সংখ্যায় এবং এই লেখাটির জন্য সেবারের বার্ষিক সংখ্যাটি বেরুনোর কয়েকদিন পরেই সি পি এম বাজার থেকে তুলে নেয়।) সি পি আই-এর আশাভঙ্গ করে জ্যাতিবাবু কেন শেষ পর্যন্ত সি পি এম-এ গেলেন তা এখনও রহস্য থেকে গেছে। নাম্বুদ্রিপাদ সম্পর্কে শোনা যায়, কেরালায় তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভাকে নেহরু সরকারের বরখাস্ত করার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। নেহরু ও তাঁর সরকার সম্পর্কে সি পি আই যে-মনোভাবে নিতে চলেছিল তাতে সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই তিনি সি পি এম-এ গিয়েছিলেন।

এখন অবশ্য এসব মতভেদের কথা অনেকটা অর্থহীন। সি পি এম-এর আদি নেতৃত্ব ও নীতি এখন অপসারিত। সি পি এম-এর রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে দশ বছর সাধারণ সম্পাদক থাকবার পর, সুন্দরাইয়ার পদত্যাগের পর। এখনকার সি পি এম-এ নেতৃত্ব জ্যোতিবাবু নাম্বুদ্রিপাদের; তাঁদের মধ্যপন্থাই এখন দলের নীতি। পুরনো তাত্ত্বিক নেতা বাসবপুন্নাইয়া এখনও আছেন বটে, তবে তিনি তো সি পি এম-র সুসলভ, স্তালিন, ক্রুশ্চভ, ব্রেজনেভ, সব আমলেই তত্ত্ব সরবরাহ করে যাচ্ছেন, তাত্ত্বিক বলে স্বীকৃতি পাচ্ছেন।

সি পি আই একটু বামে সরবার জন্য ও সি পি এম একটু দক্ষিণে আসবার জন্য এখন আর দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নেই। যে কয়েকটি বিষয়ে দুই দলের মত পার্থক্য এখনও স্পষ্ট বোঝা যায় তার একটি হল নেহরুর মূল্যায়ন। সি পি আই এখনও নেহরু নেতৃত্বের ভক্ত এবং তার ইন্দিরা বিরোধিতার যুক্তি ছিল ইন্দিরা নেহরুনীতি পরিত্যাগ করেছিলেন। তার - অতিসাম্প্রতিক রাজীব বিরোধিতার কারণও মূলতঃ তাই; রাজীব ইন্দিরা নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই তিনিও নেহরুনীতিভ্রষ্ট।

সি পি এম কিন্তু বরাবরই নেহরুবিরোধী। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দ্বিখন্ডিত হওয়ার-পর কিছুদিন সি পি এম-এর ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে-মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কাজেই নেহরু ভালো, ইন্দিরা-রাজীব খারাপ—এই ধরনের যুক্তি সি পি এম-কে খাড়া করতে হয় নি, সি পি এম এক বুরুশেই তিনজনকে মসীলেপনের কাজ চালাচ্ছে। তাই এবারের নির্বাচনী প্রচারেও ১৯৫৯ সালের ৩০ জুলাই নেহরু সরকার যে কেরালার নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিলেন সে-প্রসঙ্গ উঠেছিল। কংগ্রেসের গণতন্ত্র বিরোধিতার, রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের, রাজ্যের অধিকার খর্বের জন্য কেন্দ্রীয় প্রয়াসের উদাহরণ হিসাবে সিকি শতাব্দী পূর্বের এই ঘটনাটি এখনও উল্লিখিত হয়ে চলেছে।

নেহরুর মৃত্যুর পর স্বভাবতই এই পুরনো অস্ত্রটির ধার কিছু কমে গিয়েছিল। প্রধান অপরাধীর অপকর্মের পান্ডার অবর্তমানে সাধারণের মনে অপরাধের গুরুত্ব লাঘব স্বাভাবিক। তারপর সি পি আইয়ের নেহরুকে সরাসরি আক্রমণের অনীহা তো ছিলই। তাই একসময় কমিউনিস্টরা বলতেন, আসলে নাটের গুরু ইন্দিরা গান্ধী। স্নেহান্ধ নেহরু বরাবরের স্বৈরতন্ত্রী কন্যার প্ররোচনা ও প্রভাবে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন। এই আধুনিক ধৃতরাষ্ট্র থিয়োরিটি অনেক পাশ্চাত্য লেখক ও সাংবাদিকও গ্রহণ করেছিলেন। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সব ভারত বিশেষজ্ঞই যে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার দৌড় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তা নয়।

ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে আর কেরালায় যে-আন্দোলনের জন্য নাম্বুদিপাদ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে পর সূত্রপাত হয় ১৯৫৮ সালের প্রথমার্ধে। নেহরু ও নাম্বুদ্রিপাদের মধ্যে এই সময় বেশ কিছু পত্র বিনিময় হয়। জুলাই মাসে একটি চিঠিতে নাম্বুদ্রিপাদ নেহরুকে জানান যে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব নেহরু যে শান্তিপূর্ণ মনোভাব ও উপায়ে সমস্যা সমাধানের কথা বলেন তা মানছেন না। এই পত্রের উত্তরে এক সপ্তাহ পরে নেহরু নাম্বুদ্রিপাদকে লেখেন যে হয়ত বিরোধী দলকে কেরালার অবস্থার জন্য আংশিকভাবে দায়ী করা যেতে পারে কিন্তু মূল দায়িত্ব যে কেরালা সরকারের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসেও নেহরু নাম্বুদ্রিপাদকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে তখনকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ধেবরকে তিনি বলেছেন ধেবর যেন কেরালায় কংগ্রেসকে সংযত কারণ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধের নির্দেশ দেন। নেহরুর এই মনোভাবের পরিবর্তন শুরু হয় নতুন বছরের গোড়ায় যখন বরাবরের বামপন্থী ভি কে কৃষ্ণ মেনন তাঁকে কেরালা থেকে ঘুরে এসে জানান যে কেরালার

অবস্থার অনেক অবনতি ঘটেছে এবং কেরালার আপাতদৃষ্টিতে শান্ত পরিস্থিতির অন্তরালে নানা রকমের আপত্তিকর প্রবণতা দেখা দিচ্ছে যার ফলে শীঘ্রই অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে। নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নেহরুর প্রধান ক্ষোভ ছিল যে রাজ্যে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন মন্ত্রিসভা যাতে কমিউনিস্ট পার্টির যাঁরা সমালোচক তাঁরা নিরাপদ বোধ করছেন না এবং অনেকেরই ধারণা জন্মেছে যে মন্ত্রিসভা রাজ্যের সব দল ও গোষ্ঠীকে সমচক্ষে দেখেন না।

এই সময় নাম্বুদ্রিপাদের একটি মন্তব্য নিয়েও বেশ বিতর্ক ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। কেরালায় একটি উপনির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির জয়ের পর নাম্বুদ্রিপাদ দাবি করেন যে জনতা তাঁকে নতুন সনদ দিয়েছে এবং বিরোধী পক্ষ যদি তাদের কার্যকলাপের পরিবর্তন না করে তাহলে চীনের মতো গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হতে পারে এবং সেই গৃহযুদ্ধে চিয়াং কাইশেক-এর ভাগ্যে যা ঘটেছে কংগ্রেসেরও তাই ঘটতে পারে। নাম্বুদ্রিপাদকে একটি কড়া চিঠি লিখে নেহরু জানতে চান চিয়াং কাইশেক-এর চীনের সঙ্গে ভারতের তুলনা করার অর্থ কী। নাম্বুদ্রিপাদ জানান, ১৯৫৮-র ভারতের সঙ্গে চিয়াং কাইশেক-এর চীনের তিনি তুলনা করেন নি। সমাজতান্ত্রিক পথে জাতীয় পুনর্গঠনের নেহরু কর্মসূচীকে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ-সমর্থন করে। কিন্তু সে বিষয়ে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সহযোগিতার সবচেয়ে বড় অন্তরায় কংগ্রেসের মনোভাব। কংগ্রেসের আচরণ এমনই যে মনে হয় কংগ্রেসই সমগ্র জাতি। এই মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তন না হলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হতে পারে। এমন কি গৃহযুদ্ধেরও সৃষ্টি হতে পারে। নাম্বুদ্রিপাদ লেখেন, দেশের সর্বাগ্রগণ্য নেতা হিসাবে নেহরুকে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিরোধী পক্ষের জন্য একটি আচরণ বিধি স্থির করে দিতে হবে।

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি নেহরু বুঝেছিলেন নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা আর বেশি দিন টিকবে না। কিছু বিদেশী সংবাদপত্রে নেহরুর সেই মর্মে বিবৃতিও বেরিয়েছিল। কাজেই ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়ে ইন্দিরা গান্ধী বাপের মত পরিবর্তন করিয়েছিলেন এ-অভিযোগ অচল। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইন্দিরা কেরালায় কংগ্রেসের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার সমালোচনা করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর কথাতেই নেহরু নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেছিলেন এ-অভিযোগ ঠিক নয়। ইন্দিরা নিজেও "মাই ট্রুথ" নামে তাঁর আত্মজীবনীতে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর কথা কমিউনিস্টরা কেন বিশ্বাস করবেন?

নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার পতন সম্পর্কে নেহরুর কোন সংশয় না থাকলেও তাকে বরখাস্ত করার কোন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। ১৯৫৯ সালের জুন মাসে অর্থাৎ মন্ত্রিসভা বরখাস্তের মাস দেড়েক আগেও তিনি নায়ার সার্ভিস সোসাইটির সভাপতি ও মন্ত্রিসভা বিরোধী আন্দোলনের আদি নেতা মান্নাথ পদ্মনাভনকে এক পত্রে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে আন্দোলন দমনের অধিকার রাজ্য সরকারের আছে এবং প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করবে। কেরালা কংগ্রেসের নেতা শংকরকে তিনি লেখেন, বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক রাখা চলবে না; রাখলে তার অর্থ হবে কংগ্রেস তার নিজস্ব নীতি ও গণতান্ত্রিক রীতি বিরোধী কাজ করছে। তাতে কেরালা ও দেশের অন্যত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। একটি নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার কথা বললে গৃহ সংঘর্ষে ইন্ধন যোগানো হয়, সংবিধান অমান্য করা হয়। এই ধরণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভারত সরকারকে দমন করতে হবে কেননা শেষ বিচারে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব ভারত সরকারের।

এই পত্র লিখবার সময় নেহরুর কেরালা আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। জুন মাসের শেষ দিকে নেহরু নাম্বুদ্রিপাদের আমন্ত্রণে কেরালার অবস্থা পরিদর্শনে যান। তিনদিন সরকারি, বেসরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ও সর্বস্তরের অভিমত সংগ্রহের পর তাঁর ধারণা জন্মায় যে পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রায় হিস্টিরিয়ার আকার নিয়েছে এবং এখন আর সমঝোতার কোন অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও তিনি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চাননি। দিল্লি ফিরে তিনি নির্দেশ দেন যে কংগ্রেস স্কুল ও বাস পিকেটিং বন্ধ করুক এবং সরকারি দফতরের সামনে পিকেটিং ও ক্রমে প্রত্যাহৃত হয়ে অন্য কোন ধরণের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে রূপান্তরিত হোক।

নেহরুর ইচ্ছা ছিল কেরালায় নতুন নির্বাচন হোক ও নাম্বুদ্রিপাদ স্বয়ং এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে নির্বাচনের প্রস্তাব দিন। নাম্বুদ্রিপাদের তাতে সম্মতি ছিল না। তিনি চাইছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করুন যাতে নতুন নির্বাচনে তিনি শহীদের মুকুট মাথায় অবতীর্ণ হতে পারেন। নেহরু যে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী তা বুঝে নাম্বুদ্রিপাদ সি পি আই জাতীয় পরিষদের সঙ্গে আলোচনান্তে নেহরুকে জানান যে দেশের একমাত্র অকংগ্রেসী রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ডাকলে তা অবিচার মনে হবে এবং ধারণা জন্মাবে যে কোন রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হলে সেখানে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রথায় দাঁড়িয়ে যাবে।

এই অবস্থায় কেরালায় আন্দোলনকারীরা আগস্ট বিপ্লব বার্ষিকীতে, ৯ আগস্ট এক বিরাট বিক্ষোভের আয়োজন করেন। এই আন্দোলনের মোকাবিলায় প্রচুর রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকায় কমিউনিস্ট নেতৃত্ব চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যেই কেরালায় পুলিশের গুলি চালনায় সারা দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যে-কমিউনিস্টরা পুলিশের গুলি-চালনার প্রতিবাদে সর্বদা এত মুখর যাঁরা এতদিন বলে এসেছেন পুলিশের গুলি চালনা সরকার ও দলীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতার প্রমাণ, তাঁদেরই শাসনে পুলিশি গুলিতে কমিউনিস্ট বিরোধীরা স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে সংসদে কমিউনিস্ট দলনেতা এস এ ডাঙ্গে লোকসভায় ঘোষণা করেন যে কেরালা মন্ত্রিসভা যদি বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালনা থেকে পুলিশকে নিবৃত্ত করতে না পারেন তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করবার নির্দেশ দেবে।

৯ আগস্টের প্রস্তাবিত মহাবিক্ষোভ যাতে না হয় তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ [illegible] গোপালন জুলাই মাসের শেষ দিকে নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্বপল্লী গোপালের লেখা নেহরু জীবনীর সম্প্রতি প্রকাশিত তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে দেওয়া আছে। গোপাল লিখেছেন [illegible] ও নেতা নেহরুকে [illegible] করেন,

কেরালা সম্পর্কে কী করা কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন। নেহরু জানান, তখনও পর্যন্ত কিছুই ঠিক হয়নি। তখন তাঁরা নেহরুকে অনুরোধ করেন, কেরালার আন্দোলন না হোক অন্ততঃপক্ষে ৯ই আগস্টের মহাবিক্ষোভ যাতে প্রত্যাহৃত হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করুন। নেহরু যখন বলেন তাঁর পক্ষে একাজ সম্ভব নয় তখন অজয় ঘোষ ও গোপালন নেহরুকে জানান সেক্ষেত্রে কেন্দ্র যত তাড়তাড়ি হস্তক্ষেপ করে ততই ভাল—"দা সুনার ইউ অ্যাক্ট দা বেটার।" তার কয়েকদিন পরে, ৩০ জুলাই কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়।

রাষ্ট্রপতির ঘোষণার উপর লোকসভায় যে আলোচনা হয় তার উত্তর নেহরু দিয়েছিলেন ১৯ আগস্ট। নেহরু বক্তৃতা সংকলনের চতুর্থ খন্ডে এই বক্তৃতাটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই বক্তৃতাতে নেহরু স্বয়ং এই সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ দিয়েছেন। নেহরু বলেন, রাষ্ট্রপতির ঘোষণার তিন চারদিন আগে অজয় ঘোষ ও গোপালন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎ কিছু গোপন ব্যাপার নয় এবং এর উল্লেখ তিনি করতেন না যদি না লোকসভার এই আলোচনার সময় গোপালন এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করতেন। গোপালনের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট নেতাদের অনুরোধে ওই সংকটকালে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ হয়েছে এই ধারণার নিরসন করা। নেহরু বলেন, তিনি ইতিপূর্বেই ঘোষণা করেছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ চাননি। অজয় ঘোষ ও গোপালনও ঠিক ওই ভাষায় কেন্দ্রকে হস্তক্ষেপ করবার জন্য বলেননি। কিন্তু তাঁদের উক্তি এই ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের চেয়ে তাঁদের কাছে বেশী স্বাগত আর কিছু হতে পারে না।

নেহরু বলেন অজয় ঘোষ ও গোপালন জানান যে বিমোচন সমর সমিতি সেক্রেটারিয়েটে এক বিরাট জনসমাবেশ করে সেক্রেটারিয়েট দখলের চেষ্টা করবে। নেহরু উত্তর দেন এ-কাজ অত্যন্ত গর্হিত হবে। দুই কমিউনিস্ট নেতা তখন তাঁকে বলেন, তাহলে তিনি এই কর্মসূচী ও কার্যত সমস্ত আন্দোলন বাতিলের ব্যবস্থা করুন। না হলে কেন্দ্র যত তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করেন ততই মঙ্গল। "দা সুনার ইউ অ্যাক্ট দা বেটার"। নেহরু বলেন, এই বিরাট আন্দোলনকে সেই অবস্থায় বা আরও আগে বন্ধ করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে প্রশাসনিক দমন যন্ত্রের (কোয়ার্সিভ অ্যাপারেটাস) সহায়তায় তিনি এই আন্দোলনের মোকাবিলা করতে পারতেন কিন্তু তাঁর কথায় আন্দোলন প্রশমিত হত না। কমিউনিস্ট নেতৃদ্বয়ও তা বেশ ভালো জানতেন। তাই তাঁরা যা বলছিলেন তাতে নেহরুর মনে হয়েছিল তাঁদের অভিমত যে যত তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয় ততই মঙ্গল।

নেহরু বলেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার পর তার ঔচিত্য নিয়ে কংগ্রেসের অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে জেগেছিল স্বস্তিবোধ। কমিউনিস্টরা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন, একথা বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তবে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন যে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যার মোকাবিলা করা কমিউনিস্টদের পক্ষে ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ওই পরিস্থিতিতে যেকোন সরকারের অবস্থা কঠিন হত। এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া ওই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের অন্য উপায় ছিল না। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের একমাত্র বিকল্প হতে পারত রাজ্য সরকারের ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। তাতে যে প্রাণনাশ হত, বিপুল ক্ষতি হত, সাধারণ মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করত তা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিক হিসাবে কমিউনিস্টরা চাননি। নেহরু আবার বলেন, তাঁর যতদূর মনে পড়ে ঠিক যে কথাগুলি এই দুই কমিউনিস্ট নেতা ব্যবহার করেন তা হল, "যদি আপনি এইসব বন্ধ করতে না পারেন তাহলে যত তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করেন ততই ভাল। "ইফ ইউ ক্যাননট স্টপ অল দিস, দা সুনার ইউ অ্যাক্ট দা বেটার"।

নেহরুর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে গোপালন বলেন, তাঁরা ঠিক যে কথাগুলি বলেছিলেন তা হল, "আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা কি বলবেন? আপনারা কি হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছেন?" আমরা জানতে চেয়েছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নেহরু উত্তর দেন, গোপালন যে কথাগুলি বললেন তা তাঁরা বলেছিলেন। কিন্তু শুধু ওই কথাগুলিই তাঁরা বলেননি। আরও কিছু বলেছিলেন এবং উত্তরে তিনি বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি, তবে সবকিছু তাঁদের ওই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এরপর লোকসভার আলোচনায় গোপালন বা অন্য কোন কমিউনিস্ট নেতা নেহরুর উক্তির আর কোন প্রতিবাদ বা খন্ডনের চেষ্টা করেননি। কাজেই ধরে নেওয়া যায় প্রতিবাদের কিছু ছিল না।

গোপালের বইতে আছে নেহরু নাম্বুদ্রিপাদকে লিখেছিলেন, কোনরকম কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপে তাঁর অত্যন্ত অনিচ্ছা ছিল কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে দেওয়া এবং এই সংঘর্ষ ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চলতে দেওয়া উচিত হবে না। "আমাদের মনে হয়েছে এমন কি আপনার সরকারের দিক থেকেও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ এখন করাই ভাল।" গোপাল লিখেছেন, নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হওয়ার পরে নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অজয় ঘোষ ও গোপালন কার্যতঃ স্বীকার করেন কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের জরুরী প্রয়োজন হয়েছিল।

নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা বিরোধী আন্দোলনের আদি নেতা মান্নাথ পদ্মনাভনের সঙ্গে পরবর্তীকালে সি পি এম-এর বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। নাম্বুদ্রিপাদ স্বয়ং পদ্মনাভনের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। পদ্মনাভনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তাঁর নেতৃত্বগুণের প্রশংসা করে নাম্বুদ্রিপাদ এক দীর্ঘ প্রবন্ধও লেখেন। অথচ যে নেহরু কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মন্ত্রিসভাকে এক দুরূহ সংকট থেকে উদ্ধার করবার জন্য তাঁর নিজের দলের স্বার্থ ও তাঁর নিজের গণতান্ত্রিক সুনামের কথা না ভেবে অনিচ্ছায় ও অকালে কেরালায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন সেই নেহরু ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে কেরালা সম্পর্কিত অপপ্রচার পঁচিশ বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে।।

মরজি মহল

বনফুল

।।৮ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্করও বলেছেন যে জয়প্রকাশ নারায়ণের উপর কোনও হামলা করা হয়নি, তাঁকে বক্তৃতা দিতে কেউ বাধা দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের কটুমন্তব্য শুনে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়েছিল। সেটা স্বাভাবিক। সাধারণ লোকরা কিন্তু বলছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে বেরুলেও মিথ্যা সত্য হয় না। তবে সাধারণ লোকরা তাঁর তোষামোদ-পটুতা দেখে ভারি কৌতুক বোধ করছে। চমৎকার!

লেখকদের অনেক কষ্ট। অসাধু প্রকাশক, বেরসিক পাঠক-পাঠিকা, পরশ্রীকাতরতার কামড়—এসব তো আছেই। কিন্তু সব চেয়ে কষ্ট ছাপার ভুল। আমার একটি বইও নির্ভুল ছাপা হয় নি। কাল বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত আমার 'জঙ্গম' পড়ছিলাম। ছাপার ভুল ভরতি। মলাটটি রংচঙে, ভিতরে কিন্তু ভুলের কাঁটায় ভরতি। শস্তা বাজে ছাপাখানায় ছাপানোর ফল।

হায় হায় বঙ্গ-লেখক
 সত্যি তুমি বড়ই একক।
কেউ বোঝে না তোমার কষ্ট
 নানাভাবে করছে নষ্ট।

।।৯ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

কাগজের কচকচি আর ভালো লাগে না। দেশে সেই জয়প্রকাশ, ইন্দিরা, আর মোরারজি, আর বিদেশে সায়গন, কাম্বোডিয়া নিয়ে রুশ আমেরিকার ঝগড়া।

তপ্ত রোদে খোলা মাঠে
 শালিক পাখীর দল
 পাকিয়েছে দঙ্গল।
তপ্ত রোদে দ্বারে দ্বারে
 ভিখারী হাত পেতে
বলছে মাগো দাও না দুটি খেতে
তপ্ত রোদে ফেরিওলা
 হাঁকছে উঁচু গলায়
ডাক তার যাচ্ছে শোনা
 দোতলা-তিন তলায়
রঙ্গনার পান-বসন্ত
 হয়েছে কাল থেকে
গৌরের মা চান করতে
 যাবে এখন লেকে
এসব কথাই সত্যি
রাজনীতি তো মিথ্যে দিয়ে ভর্তি
 মিথ্যে এবং ভান
তাই নিয়ে কাগজেতে
 ডাকাচ্ছে আন্‌বান্‌
কাগজ টাগজ পড়ব না কো আজ
খুঁজব কোথা দোয়েল পাখী
 করছেন রেওয়াজ।

।।১০ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

অনেকদিন পরে বাড়ির সামনের মাঠে দেখলাম একটি কালো গাই চরছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বাংলা দেশের অনেক ছবি হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এই ছবিটাও আজকাল বড় দেখতে পাই না। খুব ভালো লাগল। প্রসঙ্গত মনে পড়ল গ্রীষ্মকালে আগে আমরা পান্তাভাত বাসী টক দিয়ে খেতে খুব ভালবাসতাম। সেটাও আজকাল দুর্লভ। আমানির নামই তো অনেকে ভুলে গেছে। আজকাল বড়লোকরা শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করেন। সেকালের বড়লোকরা খস্‌খস্‌-এর ভিজে পরদা-দেওয়া ঘরে বসে আমপোড়ার শরবৎ খেতেন। তখন ইলেকট্রিক ফ্যান ছিল না। ছিল হাত-পাখা আর টানা পাখা। তখন লোড-শেডিং হলে হাহাকার করতে হত না। তখন বাধ্য চাকরেরও অভাব ছিল না। তখন দেশ জুড়ে এত ইউনিয়ন হয় নি, কারখানাও হয় নি। গরীব লোকেরা গাছতলায় বসে বিনা পয়সায় আরাম পেত। এখন গাছও নেই। সব কেটে তক্তা করে ফেলেছে। এখন শুনি দেশ জুড়ে নানা রকম প্ল্যানিং হচ্ছে না কি। সুখ কিন্তু কমছে।

 নানা জাতের মন্ত্রী জুটে করছে কেবল মন্ত্রণা
 যন্ত্র আসছে নানা রকম বাড়ছে খালি যন্ত্রণা।

।।১১ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

বলং বলং বাহুবলং, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এগুলো অতি প্রাচীন কথা এবং হয়ত সত্য কথা। আধুনিক চিন্তা নায়কদের মনে কিন্তু প্রশ্ন জেগেছে। তাঁরা প্রশ্ন করছেন—বাহু কি কেবল আমার হাত দুটো? বুদ্ধি মানে কি স্বার্থবুদ্ধি? বীরত্ব মানে কি খুনোখুনি তান্ডব? এর উত্তরের উপরই নির্ভর করছে মানব জাতির ভবিষ্যৎ। হিংসার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি যে খাটো নয় তার প্রমাণ এদেশে বুদ্ধ-যুগ থেকেই পাওয়া গেছে। সেই বুদ্ধদের মেরে শেষ করেছিল মুসলমানরা।

মুসলমানরাও এখন বেঁচে নেই। পরস্পর খাওয়া-খাওয়ি করে তারা নিঃশেষ হয়েছে। হিংসা বা অহিংসা কোনটা যে বেশী ফলপ্রদ ইতিহাস তা এখনও বলতে পারে নি। কখনও হিংসা জয়ী হয়েছে কখনও অহিংসা। ইতিহাস যা পারে নি আমাদের হৃদয় কিন্তু তা পেরেছে। সে জানে হিংসার নয়, প্রেমের শক্তিই সব চেয়ে জোরালো। ভালবাসার চাবিকাঠি দিয়ে সব তালাই খোলা যায়। এ সত্য জেনেও কিন্তু আমরা ভালোবাসতে পারি না। কেন? কারণ আমরা ষড়-রিপুর দাস। পৃথিবীর সভ্য সমাজ থেকে দাসত্ব প্রথা উঠে গেছে। কিন্তু এ দাসত্ব প্রথাটা ওঠে নি। এখনও প্রবল ভাবে চালু আছে।

।। ১২ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

এখন দিল্লীতে মোরারজি দেশাই মহাশয়ের প্রায়োপবেশন নিয়ে রাজনৈতিক আসর খুব গুলজার হয়েছে। সেই ওজন করে খাওয়া, সেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুলেটিন সেই প্রস্রাবে Acetone—সবই হবে মহাত্মাজীর আমলে যেমন হত। মহাত্মাজীর আমলে এ রকম আসর বারবার জমেছে এবং ভেঙে গেছে। প্রায়ই নিষ্পত্তি হয়েছে আপোষ-মীমাংসায়। বৃটিশ আমলে অনশনে মৃত্যু-বরণ করেছিলেন যতীন দাস। বৃটিশ আমলে আর একটা যে জিনিসে আসর জমত সেটা হচ্ছে গুপগাপ করে বৃটিশ অফিসার খুন, তারপর সেই হত্যাকারীর ফাঁসী। এ সব নিয়ে যে উত্তেজনা তখনকার দিনে জাগত, দেশ-প্রেমের যে উদ্দীপনা আমাদের মনে আঁকা হত—এসব উপোষে-টুপসে তেমনটি হয় না। বরং মনে হয় এসব ভড়ং এবং বুজরুকি। শুনেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নি-পর্বটা না কি ভারত সরকার তাঁদের ইতিহাস থেকে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু হায়, এসব উপোষ-মার্কা অহিংস আন্দোলন যে কত হাস্যকর এবং কত সহিংস তা যদি ভারত সরকার বুঝতেন। বোঝেন নিশ্চয়ই, বুঝেও চেপে আছেন, উপায় নেই। উপবাসকে তো বে-আইনী করা যায় না।

।। ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

মোরারজি দেশাইয়ের অনশন এখনও চলছে। কাগজে ছবি দেখলাম জয়প্রকাশ নারায়ণও সেখানে গেছেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে মোরারজি তাঁর সঙ্গে আলাপ করছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা বেরেলিতে একটি ভাষণে বলেছেন যে বাইরের চাপে আমার গভর্নমেন্ট নতি-স্বীকার করবে না, গভর্নমেন্ট যা উচিত মনে করবে তাই করবে। যাঁরা শাসন-দন্ড হাতে গদিতে বসে থাকেন তাঁরা চিরকাল এই কথা বলে এসেছেন। মহাত্মাজী আর জহরলালজীকেও বৃটিশ গভর্নমেন্ট এই কথাই বলেছিলেন। ওই চিরন্তন হুমকি সব শাসকরাই দেন। ইন্দিরাজীও দিচ্ছেন।

ইতিহাস কিন্তু বলছে যে বাইরের চাপেও গভর্নমেন্টকে বাপ বলতে হয়, যদি চাপটা খুব প্রবল হয়।

গ্রীষ্ম যখন চাপা পড়ে
আসে যখন শ্রাবণ
রাম যখন যুদ্ধে নাবেন
নিহত হন রাবণ।

।। ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

মোরারজির উপবাসের সঙ্গে
যোগ দিলেন জে. পি. র প্রভাব
যোগ দিলেন জগজীবনের আশঙ্কা
যোগ দিলেন চাবনের বুদ্ধি
যোগ দিলেন মানুদার আকুলি-বিকুলি
এত রকম চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে
ফেটে গেল ইন্দিরার জেদ-বেলুন।
জুন মাসেই গুজরাটে নির্বাচন হবে।
চন্দ্রশেখর প্রশংসা করেছেন
ইন্দিরাজীর রাজনৈতিক বুদ্ধির।
দাবা-খেলায় তাঁর দক্ষতা
আধুনিক ভাষায়—অনস্বীকার্য
আমরা নিশ্চিন্ত হলাম
উপবাস ভঙ্গ করলেন মোরারজি দেশাই।

কে জানে হয়তো পুরাতন কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মনোমালিন্যের এবার অবসান হবে। তারই হয়তো আজ সূচনা হল।

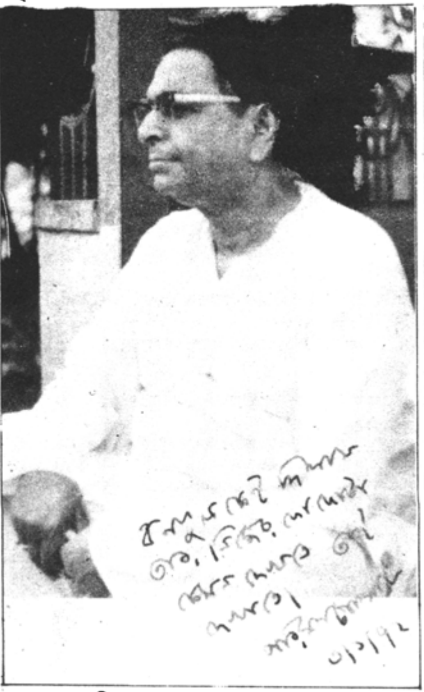

।। ১৫ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

আজ ভাই নববর্ষ দিন
ভাবিনু করিয়া কিছু ঋণ

খাওয়া যাক কিছু ভালো মন্দ
কিন্তু ভাই জাগিতেছে সন্দ
ঋণ কেউ দেবে কি
এ ঝুঁকিটা নেবে কি
কোনও ধনী পুংগব?
আমার যে সব
মায় চুল তক্
ঋণ–জালে বন্ধক।
সুতরাং ধারটার
মিলবে না আর।
অতএব এসো ভাই
নববর্ষে হাওয়া খাই
বিনামূল্যে যাবে সেটা পাওয়া
শহরের ধোঁয়া–ভরা হাওয়া।
বুক ভরে তাই টেনে হয় যদি যক্ষা
শেষকালে পাই যদি অক্কা
দুঃখ নাই। বলিতে পারিব হেসে
যে দেশেতে জন্মিয়াছি মরিলামও
সেই মহাদেশে।

।। ১৬ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

কাল থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছে। বাঙালীর মনোজগতেও ঝোড়ো হাওয়া বইছে কিছুকাল থেকে। বাইরের এই হাওয়া কি তারই বহিঃপ্রকাশ? কে জানে। বাইরের এই হাওয়া হয়তো মেঘ আনবে, বজ্র বিদ্যুতের আক্ষেপে চতুর্দিক কেঁপে উঠবে। আমাদের মনের ঝোড়ো হাওয়াতে তা হবে কি? তাও জানি না।

এ বছরের পাঁজিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা ভয়ানক। একটু আশা গতবছরও ওরা যে সব ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা সব ফলে নি। এবারও হয়তো ফলবে না।

ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধের আশংকা করে চারিদিকে সকলকে সতর্ক করেছেন এবং বলছেন সেই জন্যেই এখন Emergency আইনগুলি অত্যাবশকীয়। ভুট্টো সাহেবও শঙ্কিত। আবদুল গফ্ফর খাঁকে তিনিও আবার গৃহবন্দী করেছেন।

হৃদয় যখন ভয়ে করে ধুকপুক
আইন তখন আঁকড়ে ধরে
বে–আইনীর তাক্‌তুক্
ডাক্তারেতে থই না পেলে
ওঝা করে ঝাড়ফুক।

।। ১৭ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আজ মারা গেলেন। একটা ইন্দ্রপতন হল আজ। হিন্দুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং মহত্ব যে কোথায় তা তিনি স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন তাঁর গ্রন্থাবলীতে, ওজস্বিনী ভাষায় বলে গেছেন বহু বক্তৃতায়। তাঁর মতো বিদগ্ধ ব্যক্তি রাজনীতি ক্ষেত্রে এসে আমাদের দেশের রাজনীতিকে অলংকৃত করেছিলেন। ভাগলপুরে যখন ছিলাম তখন তাঁর মুখে বিবেকানন্দ বিষয়ে একটি ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছিলাম। অমন বক্তৃতা আর কারো মুখে কখনো শুনিনি। ভারতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলি একে একে খসে পড়ছে। অন্ধকার ক্রমশ বাড়ছে। নূতন জ্যোতিষ্ক আবার কবে দেখা দেবে ভারতের আকাশে? এখন কতকগুলি ক্ষমতাপ্রিয় স্বার্থপর লোক যে কোলাহলে দশদিক মুখরিত করছে তাই যে ভারতের বাণী নয় একথা বলবার মতো লোক আবার আসবে কি?

মনে মনে করজোড়ে চেয়ে আছি
আকুল উৎসুক
কবে পুন দেখা দেবে
ভারতের বলিষ্ঠ উন্মুখ
সত্যসন্ধী পুরুষ প্রধান
কন্ঠে লয়ে অমৃতের গান।

।। ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

অনেকদিন পরে আজ জিলাপী আনিয়ে খেলাম। রোজ একঘেয়ে লুচি তরকারি ভাল লাগছিল না। জিলাপী সহযোগে তাদেরও একটা নূতন স্বাদ পেলাম।

'যেখানে অসদুপায়ে ভোট জোগাড় করা যায় সেখানে গণতন্ত্র জঘণ্যতন্ত্র হয়ে যায়'

মরজিমহল, ৭ এপ্রিল, ১৯৭৫

জীবনের একঘেয়েমি
দূর করতে চাও যদি
বদলে ফেল সুর
কানাড়ার পরে যদি
তিলক কামোদ বাজাও
একঘেয়েমি হয়তো হবে যে দূর
মনটাকে পুরে ফেলে
একঘেয়েমির বস্তায়
দিবারাত্রি যারা কেবল পস্তায়
তারা জেনো বেকুব
এক ঘেয়েমি দূর করা
সহজ কাজ খুব
চচ্চড়ি খেতে খেতে
জিভ যখন ক্লান্ত
তখন খাও বড়া ভাজা
কিম্বা খাও পানতো।

।। ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৫।।

কবি আক্ষেপ করেন আমরা যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না। আমাদের চাওয়াটা যে চাঁদ পাওয়ার মতো। আমরা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সতীত্ব চাই, বন্ধুর মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা চাই, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সততা ও ভদ্রতা চাই, নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও ন্যায়পরতা

চাই। সবগুলিই দুর্লভ। দুর্লভ, কারণ আমাদের মধ্যে অধিকাংশই পশু, পোষাক–পরিচ্ছদ পরা তকমা অলঙ্কারধারী বাঘ ভাল্লুক শেয়াল কুকুরই চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কাছ থেকে যা পাওয়া সম্ভব তাই পাচ্ছি। একটা কুৎসিৎ জরা–জীর্ণ বৃদ্ধাকে গিয়ে যদি বলি তোমার মধ্যে আমি তিলোত্তমা খুঁজছি—তা যেমন হাস্যকর, আমাদের দুর্লভ জিনিস চাওয়াটা তেমনি হাস্যকর। দুর্লভ জিনিস পাওয়ার জন্যেও তপস্যা করতে হয়। ওদেশের বিজ্ঞানীরা তপস্যা করেছিলেন তাই তাঁরা চাঁদও পেয়েছেন। ভগীরথ তপস্যার জোরেই গঙ্গাকে মর্ত্যে এনেছিলেন।

আমরা কিছু করব না
আমরা কেবল চাইব
কেমন করে পাইব ?

।। ২০ এপ্রিল, ১৯৭৫ ।।

কাল বিকেলে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে দেখে এলাম। বড় দুর্দশায় আছে দেখলাম। নিজে উঠতে বসতে পারে না। ধরে ধরে বসিয়ে দিতে হয়। বিড়ি খাচ্ছে নিজে বিড়ি ধরে থাকতে পারছে না। অপরে বিড়িটা মুখে ধরে আছে। ডাক্তাররা খালি Liquid খেতে বলেছেন। আমি বললাম ওর যা ভালো লাগে তাই খাক।

শৈলজানন্দের বাড়ি থেকে গেলাম সুধা বৌদির কাছে। দেখলাম ইরু রয়েছে। ছেলে হয়েছে তার। খুব ভালো লাগল। খানিকক্ষণ গল্প করে গরম সিঙাড়া খেয়ে চলে এলাম।

বিকেলটা ভালই কাটল কাল। আজ সকালে কালু ও বাসন্তী এসেছে।

প্রত্যক্ষ দাঁড়ায়ে আছে রৌদ্র দীপ্ত
প্রচন্ড বৈশাখ
অন্তরীক্ষে অপেক্ষিছে লক্ষ লক্ষ
নক্ষত্র নির্বাক।
অগ্নির জয়যাত্রা অহোরাত্র
অব্যাহত আছে
কখনও বা বহুদূরে
কভু খুব কাছে।
কাছে দগ্ধ হই তাপে
দূর থেকে দেখি মুগ্ধ হয়ে
অগ্নির নানা ছবি দূরত্বের মাপে।

ধারাবাহিক

এক মৃতব্যক্তি বাংলাদেশ শাসন করছেন

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। সেই দিনটির কথা স্মরণে রেখেই বর্তমান আলোচনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আবার তিনি সেই বাংলাদেশের মাটি থেকেই চিরকালের মত বিদায় নেন। সপরিবারে নিহত হন চক্রান্তকারীদের গুলিতে। কিন্তু তবুও সেখানে তার ভাবমূর্তিকে গুলিবিদ্ধ করা যায়নি। বরং নিহত মুজিব, জীবিত মুজিবের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। সপরিবারে তাঁকে খুন করে সৈন্য বাহিনীর দুই তরুণ অফিসার কর্ণেল ফারুক ও কর্ণেল রশিদের নেতৃত্বে শ' তিনেকের মত সৈনিক ও অফিসার। অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে তখন ছিল আশি হাজারের মত সৈনিক। তাদের পরিচালনার জন্য অনেক 'তকমা পরা' বাঘা বাঘা কয়েক ডজন ফৌজি অফিসার। ছিল শেখ মুজিবের বিশ্বস্ত রক্ষীবাহিনীর হাজার বিশেক জওয়ান। আধা সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস বা বি.ডি. আর ও সশস্ত্র পুলিশ ইত্যাদির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু সৈন্যবাহিনীর ঐ দুই তরুণ অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালিত শ' তিনেক সৈনিকের কাছে তাদের সবাই যেন বিধবার মত অসহায় হয়ে বসে রইলো।

এমন কি মুজিব প্রতিষ্ঠিত বাকশাল দলের হাজার হাজার সশস্ত্র 'এ্যাক্টিভিস্ট', অগণিত নেতা, হাফ নেতা, উপনেতা ও কর্মী নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রেখে বোবা হয়ে গা ঢাকা দিলেন। কারো মুখে একটা কথাও ফুটলোনা। কারো অস্ত্র থেকে একটা গুলিও ছুটলো না। বরং মুজিবের লাশ তাঁর বাস ভবনের রক্তেভেজা সিঁড়িতে রেখেই একদল বাকশাল-নেতা মন্ত্রিত্বের টোপর পরতে চললেন। ব্যতিক্রম শুধু চারজন--সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আমেদ, ক্যাপ্টেন (অব)মনসুর আলি ও কামারুজ্জামান। মুক্তি যুদ্ধের প্রবাদ পুরুষ কাদের সিদ্দিক (বাঘা))মুজিব হত্যার প্রতিশোধ নিতে অবশ্য আবার অস্ত্র ধরেছিলেন। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বুড়িডাঙ্গার জল তখন অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। তাঁর স্রোতকে ভিন্নমুখি করা তখন খুবই কঠিন কাজ।

শেখ মুজিবের এই মর্মান্তিক পরিণতি ও তার অনুসারী এবং অনুরাগীদের লজ্জাকর অক্ষমতা দেখে দেশি-বিদেশি অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অনুমান করেছিলেন যে মুজিব ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি যত বড় আন্দোলক ছিলেন তত বড় প্রশাসক নন। আর তা নন বলেই তাঁর শাসনে বাংলাদেশে প্রায় অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে, দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার আগে শেখ মুজিব নিজেই বলেছিলেন, 'খুনীদের হাতে তিন হাজার আওয়ামি লিগ নেতা ও কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছে।' থানা লুঠ, ব্যাংক ডাকাতি ইত্যাদি প্রায় নিত্যকার ঘটনা। দুর্নীতি আকাশস্পর্শী। শেখ মুজিব এক জনসভায় নিজেই দুঃখ করে বলেন, 'আমি ভিক্ষা করে বিদেশ থেকে জিনিসপত্র আনি, চোরারা তার উপরও চাটান দেয়।' ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাতে সেদেশের, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ প্রাণ হারান। একশ্রেণীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের তাই ধারণা, এই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতার দরুণ, মুজিব জীবনের শেষ দিকে শুধু তাঁর অভাবনীয় জনপ্রিয়তা নয়, সমস্ত মানুষের শ্রদ্ধা হারান। আর তারই ফলে মাত্র শ' তিনেক সৈন্যের পক্ষে তাঁকে খুন করা সম্ভব হয়। এই নিষ্ঠুর বর্বরতার বিরুদ্ধে সে দেশ যে সেদিন গর্জে ওঠেনি, বিক্ষোভে ফেটে পড়েনি, সে ঐ একই কারণে।

কিন্তু ১৯৭৬ সালে জনৈক বৃটিশ সাংবাদিক ঢাকায় এসে বললেন অন্য কথা। লন্ডনের দি গার্ডিয়ান পত্রিকার ঐ সংবাদদাতা তাঁর পত্রিকার জন্য প্রথম যে প্রতিবেদনটি পাঠান, তার শিরোনাম 'এ ডেডম্যান ইজ রুলিং বাংলাদেশ'--এক মৃত ব্যক্তি বাংলাদেশ শাসন করছেন। আর ঐ সংবাদে উল্লেখিত ব্যক্তি হলেন শেখ মুজিবর রহমান।

১৯৭৬ সালে তৎকালীন মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজের অবস্থাকে মোটামুটি পাকাপাকি করে নিয়েছেন। কিন্তু মৃত মুজিবকেই তাঁর বেশি ভয়। আর সেই ভয়ের রোগ থেকেই তিনি শেখ মুজিবের ছবিকে পর্যন্ত সইতে পারছেন না। সমস্ত সরকারি অফিস থেকে তিনি সেগুলি সরিয়ে ফেলার হুকুম দিয়েছেন। মুক্তি যুদ্ধের জয়ধ্বনি 'জয় বাংলা'কে নিষিদ্ধ করেছেন। 'বাংলাদেশ বেতারে'র হয়েছে নতুন নামকরণ 'রেডিও বাংলাদেশ'। অর্থাৎ যে সব জিনিসে রয়েছে শেখ মুজিবের স্পর্শ, সেগুলিকে তিনি ধুয়ে-মুছে ফেলতে চান। সরিয়ে দিতে চান জনগণের চোখের সমুখ থেকে। এই ভীতি থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি পরিবর্তনের চিন্তা তার মাথায় ঢুকেছিল। নতুন গান লেখান হয়েছিল। সুর সহযোগে তার 'টেপ' ও তৈরি। কিন্তু জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সে দিক দিয়ে তিনি আর এগোননি।

জেনারেল জিয়ার ভয় ঐ জনগণ। কেননা তিনি জানতেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে শেখ মুজিবকে মেরে ফেলা যায়নি, তাঁর নাম মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। জীবিত মুজিবের চেয়ে সেই মৃত মুজিবই অধিকতর শক্তিশালী। জেনারেল জিয়ার ছিল সেইটেই বড় ভয়।

শেখ মুজিব যে বাংলাদেশের জনমনের কতখানি স্থান জুড়ে আছেন, তার প্রমাণ মিলল ১৯৮১ সালের ১৭ মে। সে দিনই শেখ মুজিবের বড় মেয়ে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ দীর্ঘ ছয় বছর দিল্লিতে কাটিয়ে ঢাকা ফিরলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই আওয়ামি লিগ তাঁকে দলের সভাপতি নির্বাচন করেছেন।

ঢাকার আকাশ সেদিন মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় বইছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সেই দুর্যোগের মধ্যেও ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আশে পাশের রাস্তাগুলি যেন জনসমুদ্র। সেদিন শেখ হাসিনাকে দেশের মাটিতে অভ্যর্থনা জানাতে কত লক্ষ লোক সেখানে হাজির হয়েছিলেন, তার হিসেব করা মুশকিল। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত স্টিফেন সাহেব সে দিন ঢাকায় ছিলেন। পরদিন দেশে ফিরে দমদম বিমান বন্দরে তিনি সাংবাদিকদের জানালেন, 'এমন জনসমুদ্র জীবনে চোখে দেখিনি।'

শেখ হাসিনার বয়স তখন মাত্র ৩৪ বছর। বাংলাদেশে তখন তাঁর পরিচিতি শেখ মুজিবের কন্যা হিসাবে, রাজনৈতিক নেতা

হিসাবে নয়। তবু দেশে ফিরে তিনি সেদিন যে বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন, তা মুজিবের জন্যেই। লক্ষ লক্ষ জনতা শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, পরোক্ষে শেখ মুজিবকেই অভ্যর্থনা জানালেন।

জেনারেল জিয়া জানতেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে জনসমুদ্রে ঢেউ উঠবে। সেই ঢেউকে বিপথগামী করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাওয়াই বাতলিয়ে ফেললেন। ভারত বিদ্বেষের সেই পুরানো দাওয়াই। একদল দাঙ্গাকারী ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনার অফিসের সামনে গিয়ে হাঙ্গামা করলো। বললো, তালপট্টি (নিউমূর-দ্বীপ) বাংলাদেশের। ভারত সেই দ্বীপে নৌবাহিনী পাঠিয়েছে। এটা ভারতের বাংলাদেশ আক্রমণের সামিল।

বস্তুত ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ হাসিনাকে আওয়ামি লিগ দলের সভাপতি নির্বাচন করার পর থেকেই জিয়া ভারত বিরোধী ও হাসিনা বিরোধী প্রচার শুরু করেন। শেখ হাসিনার দীর্ঘদিন দিল্লিতে থাকা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। অভিযোগ করেন, ভারত বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই শেখ হাসিনাকে এখন বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। হাসিনার ঢাকা উপস্থিতির প্রাক্কালে তিনি তালপট্টি (নিউমূর-দ্বীপ) তে গানবোট পাঠান, যদিও তিনি জানতেন যে বঙ্গোপসাগরে মাথা তুলে ওঠা নতুন দ্বীপ ভারতেরই অঙ্গ। ভারত সেখানে একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাতেই বাংলাদেশের গানবোটগুলি ভারতীয় জলসীমা থেকে পালিয়ে যায়।।

কিন্তু জিয়ার এ দাওয়াইয়ে কাজ হয়নি। হাসিনার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে কোন ফল ফলেনি। হাসিনা যে পথে গেছেন, যে স্থানে গেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানেই এগিয়ে এসেছেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশের নদী-নালার মত শেখ মুজিবের প্রভাব দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। খুনীদের বুলেট শেখ মুজিবের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারলেও তাঁর প্রভাবকে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারেনি। এর কিছুদিন পরেই চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান সৈন্যবাহিনীর একদল বিক্ষুব্ধ অফিসারের আক্রমণে প্রাণ হারান।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার পরে প্রেসিডেন্ট হন বিচারপতি আব্দুর সাত্তার। মাত্র কয়েক মাসের জন্য। ১৯৮২ সালের মার্চে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন সৈন্যবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল হোসেন মহম্মদ এরশাদ। এরশাদ সাহেব রাজনীতির লোক না হলেও, রাজনীতি বোঝেন। বাংলাদেশের মানুষের মনে কতো গভীরভাবে শেখ মুজিবের নাম লেখা, সেটা পড়তেও তিনি ভুল করেন না। মুজিব সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে, কৌশলে তিনি বলেন, 'ইতিহাসকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনা।' এর অর্থ একটাই-শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোনা যায়, ক্ষমতা দখল করেই তিনি আওয়ামি লিগকে ডেকেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেবার জন্য। আওয়ামি লীগ এরশাদের সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। ঐ দলের সঙ্গে কোন রকম রফা না হলেও জেনারেল এরশাদ এমন কতগুলি কার্যসূচী রূপায়নের কাজে হাত দেন, যেগুলি ছিল শেখ মুজিবের বাকশাল কর্মসূচীরই অঙ্গ। দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করা যায়, বাংলাদেশে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার পত্তন। পুরনো জেলাগুলিকে ভেঙে ৬৫টি জেলা গঠন। বিচারকে সহজলভ্য করার জন্য প্রতি ইউনিয়নে একটি করে গঠন। বিচারকে সহজলভ্য করার জন্য প্রতি ইউনিয়নে একটি করে আদালত স্থাপন। হাইকোর্টকেও শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ না রেখে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া। মুজিব হত্যার পর জেনারেল এরশাদই হলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক, যিনি শেখ মুজিবরের প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গত বছর ১৫ আগস্ট (মুজিব হত্যার দিন) এরশাদ সাহেব মুজিবের জন্মগ্রাম ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবের মাজারে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে এসেছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন, এর সবই হল এরশাদের নিজের পালে মুজিব-হাওয়াকে খানিকটা টেনে নেবার চেষ্টা। জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি। তখন তিনি পাকিস্তানে। জেনারেল মঞ্জুর আমেদ, কর্ণেল তাহের প্রমুখ পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিলেও এরশাদ সাহেবকে পাকিস্তান থেকে একপা নড়ানো যায়নি। কাজেই শেখ মুজিবের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়।

কিন্তু জেনারেল এরশাদ জানেন মুজিবের নামে ডাক না দিলে বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাবে কারণ জীবিত মুজিবের চেয়েও বাংলাদেশে নিহত মুজিবের প্রভাব বেশি। শেখ মুজিবের নাম সে দেশের ঘরে ঘরে রূপ কথার নায়কের মত ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে নিহত মুজিবের এই অভাবনীয় প্রভাব লক্ষ্য করেই ১৯৭৬ সালে বৃটেনের 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার ঢাকার সংবাদদাতা লিখেছিলেনঃ এক মৃতব্যক্তি বাংলাদেশ শাসন করছেন। □

পরেশ সাহা

কৃষ্ণচন্দ্র কথা

কালীঘাটের কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি জীবিত থাকতেন, নিশ্চয়ই আমেথিতে রাজীব-এবং মানেকার বিরুদ্ধে প্রার্থী হতেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় বিলেতে ছিলেন। মহারাণীর বাড়ির সামনে অনশনে বসেছিলেন। সেই শুরু। তারপর শুধু চমক দেখিয়ে গেছেন। যা-কিছু করেছেন, খবরের কাগজের প্রথম পাতার বড় খবর।

নেহরু যতবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, খবরের কাগজের কে. কে চ্যাটার্জি (কালীঘাটের কেষ্টদা) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিবার জমানৎ জব্দ হয়েছেন। ভেবেছেন একদিন হয়তো রবার্ট ব্রুস হবেন। পারেন নি। ফী বছর গঙ্গা সাগরে যেতেন। একদিন মামলা ঠুকে দিলেন। কপিলমুনির মন্দিরে পড়া প্রণামী নিয়ে শুরু হয়ে গেল আদালতি লড়াই। আর একটা মামলা করেছিলেন যার দৌলতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র প্রবক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি কে. কে. রেজিস্ট্রি করে ফেলেন। রেজিস্টার্ড কংগ্রেসের সভাপতি কেষ্টদা ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেসের নাম অন্য কেউ ব্যবহার করলে কাজটি বেআইনি হবে। তিনি মামলা করবেন ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন। দাঁড়িয়েছিলেন ইন্দিরার বিরুদ্ধে না, জমানৎ রাখতে পারেন নি। বেঁচে থাকলে তিন পুরুষের বিরুদ্ধে লড়াই এ একটা রেকর্ড রেখে যেতেন! □

নিজস্ব প্রতিনিধি

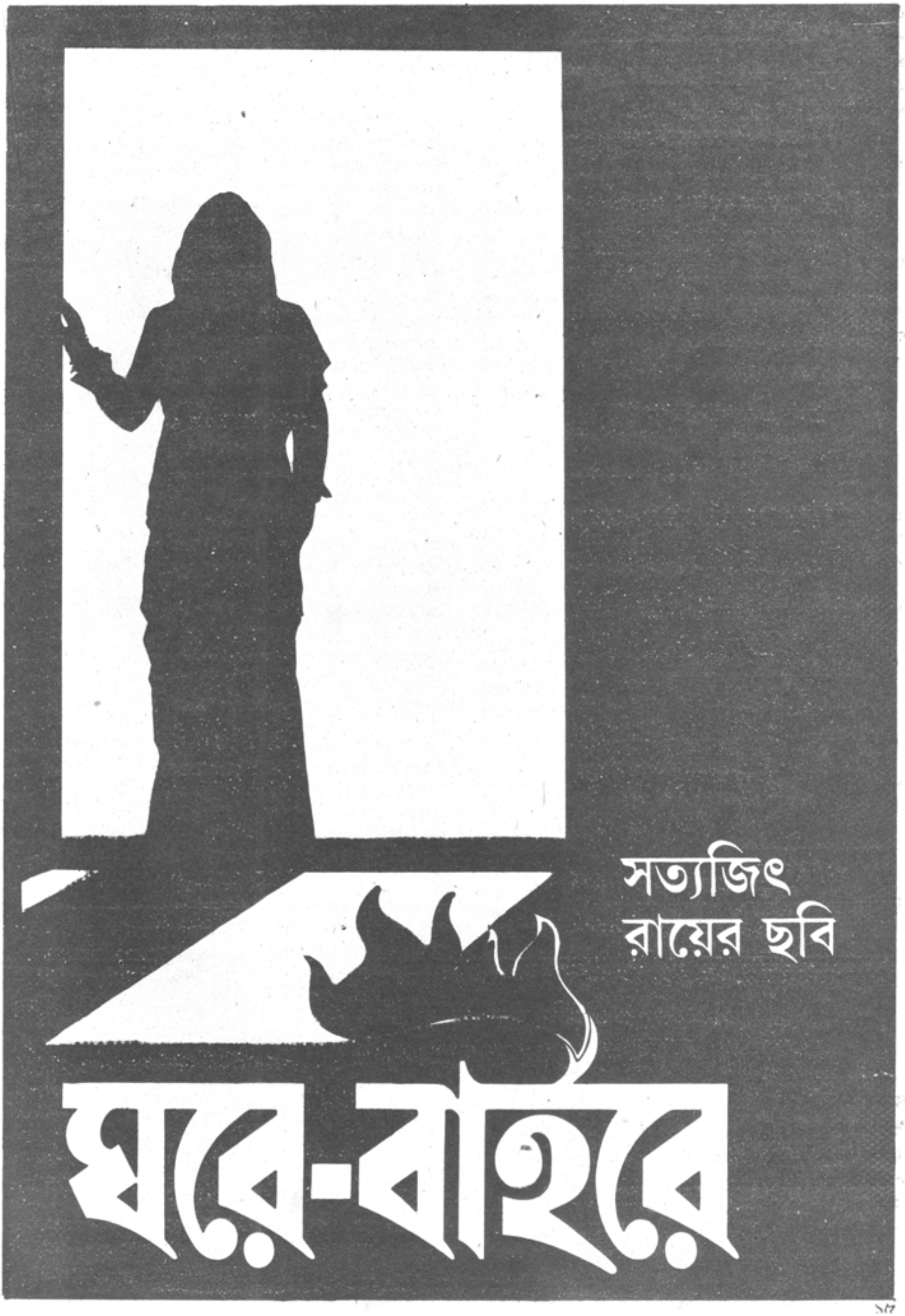
সত্যজিৎ
রায়ের ছবি
ঘরে-বাইরে

ঘরে-বাইরে বিতর্কের পূর্বাভাস

বীরেন্দ্র দাশশর্মা

উপন্যাস যখন রবীন্দ্রনাথের, আর, পরিচালক যখন সত্যজিৎ রায় তখন চলচ্চিত্রানুরাগী দর্শকের উৎসাহিত হয়ে ওঠার বিশেষ কারণ রয়েছে সন্দেহ নেই ঘরে-বাইরের আগে সত্যজিতের হাতে রবীন্দ্রনাথের চারটি ছোট গল্পের অসাধারণ ও সার্থক চিত্ররূপ আমরা পেয়েছি। নষ্টনীড় অবলম্বনে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র চারুলতা ছাড়া তিনকন্যা ছবিতে মণিহারা, পোস্টমাস্টার ও সমাপ্তি এই তিনটি ছোট গল্পের ছোট মাপের কাহিনীচিত্রের স্মৃতি এখনও অম্লান। আশ্চর্যের কথা হলেও এ কথা সত্যি যে ঘরে বাইরের আগে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাসের চিত্ররূপ দেন নি। এর কারণ হয়তো চারুলতা সম্পর্কিত বিতর্ক যেখানে সত্যজিতের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল: প্রশ্ন উঠেছিল পরিচালকের স্বাধীনতা নিয়ে। সাহিত্যের চিত্ররূপ সম্পর্কে এই বিতর্কের উত্তরে কলমও ধরতে হয়েছিল সত্যজিৎকে। সুতরাং ঘরে-বাইরের মতো জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত উপন্যাসের চলচ্চিত্র হয়তো নুতন করে বিতর্কের ঝড় তুলবে,- শুধু নন্দনতাত্ত্বিক প্রশ্নই নয়, প্রশ্ন উঠবে ছবির রাজনীতি ও দর্শন নিয়েও। তাছাড়া সাবখ্যাত কান্ চলচ্চিত্র উৎসব থেকে এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত ছবিটি শূন্য হাতে ফিরে আসায় ছবির শিল্পগুণ সম্পর্কেও দর্শকের জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছে বৈকি।

ঘরে-বাইরে : নির্মাণের ইতিহাস

ঘরে-বাইরে উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়িত হওয়ার কথা ছিল অনেক অনেক বছর আগে, ১৯৪৮ সালে। ঐ সময় সত্যজিৎ রায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে ঘরে-বাইরের চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছিলেন। এমনকি একজন চিত্র-প্রযোজক চিত্রনাট্যটি শুনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। সে সময়ে অবশ্য ছবি পরিচালনার কথা ছিল সত্যজিতের নয়, বন্ধু হরিসাধন দাশগুপ্তর। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রযোজক চিত্রনাট্যটিতে কয়েকটি পরিবর্তনের কথা বলেন, যা সত্যজিৎ মেনে নিতে পারেন নি। ফলে ছবির কাজ শুরু হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। এখন অবশ্য সত্যজিৎ মনে করেন যে সে সময়ে ছবিটি তৈরি না হয়ে ভালোই হয়েছিল। সেই প্রথম

> ঘরে বাইরের মতো জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত উপন্যাসের চলচ্চিত্র হয়তো নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলবে— শুধু নন্দনতাত্ত্বিক প্রশ্নই নয়, প্রশ্ন উঠবে ছবির রাজনীতি ও দর্শন নিয়েও

চিত্রনাট্যটি ছিল নিতান্তই কৃত্রিম, হলিউডের অনুকরণ। দিন যত গেছে সেই বিগত যুগ সম্পর্কে তাঁর ধারণাও ক্রমশ আরো পরিশীলিত হয়েছে, মূল উপন্যাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে তাঁকে সাহায্য করেছে নানান বইপত্র। বস্তুত: এতদিন ধরে তিনি গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছেন – এর ফলে সেই বিশেষ যুগটিকে আরো নিখুঁতভাবে তুলে ধরা সহজতর হয়েছে বলেই তাঁর বিশ্বাস। প্রথম চিত্রনাট্য থেকে আজকের নির্মিত ছবির মাঝখানে যে বিস্তৃত সময়ের ব্যবধান রয়েছে তার মধ্যে সত্যজিৎ শুধু নিজেই বিকশিত হন নি ঘরে-বাইরে সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তাও আরো পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক পটভূমিকায় এই ত্রিকোণ প্রেমের গল্পটিকে চিত্রায়িত করতে সত্যজিৎকে পরপর একাধিক অনন্য সব সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। উপন্যাসের ডায়ারি বা আত্মকথার ধরনটি একদিকে তাঁকে যেমন চরিত্রগুলির মনের গভীরে অনুপ্রবেশে সাহায্য করেছে, তেমনি মূল উপন্যাস থেকে চরিত্রদের সাজপোশাক, ঘর, আসবাবপত্র, পরিবেশের বিশেষ কোনো বর্ণনা পান নি। এ সমস্যার সমাধানের জন্য সত্যজিৎকে রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে সেই বিশেষ সময়ের জীবন নিয়ে। নানা পত্রপত্রিকা, ফটোগ্রাফি, পেইন্টিং ইত্যাদি থেকে তিনি সে সময়ের জীবনযাত্রার আভাসই শুধু সংগ্রহ করেন নি, আসবাবপত্র, প্রসাধন দ্রব্য, চুলবাঁধার কৌশল, গহনা, পোশাকের ডিজাইন, ঘর সাজানোর জিনিসপত্র ইত্যাদি সমস্তই হুবহু যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছেন। ছোটখাটো ব্যাপারেও সত্যজিৎ নিখুঁত হতে চান বলে এমনকি আলমারিতে সাজানো শাড়িগুলির প্রত্যেকটির ডিজাইন নিজে করেছেন এবং তদনুযায়ী শাড়ী তৈরিও করা হয়েছে একটি ছোট সিগারেটের প্যাকেটও তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়। 'পিরিয়ড পিস' নির্মাণে সত্যজিতের সেট-কে যতদূর সম্ভব বাস্তবানুগ করার চেষ্টার জন্যই ঘরে-বাইরে প্রচণ্ড ব্যয়বহুল হয়েছে। এন এফ ডি সি প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে 'গান্ধী' ছবিটির পরেই ঘরে-বাইরের স্থান। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ছবির শুটিং শুরু হয়। ছবির কাজ চলাকালীন সত্যজিৎ দুবার হার্ট অ্যাটাকে ভোগেন। প্রথমবার বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করেন, বাইপাস সার্জারিও হয়। কিন্তু সামান্য কিছু কাজ বাকি থাকতে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে পুত্র সন্দীপ রায় ছবির কাজ শেষ করেন, এডিটিং সত্যজিতের তদারকিতে হয়। ঘরে-বাইরে লণ্ডনে মুক্তি পায় এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে। সত্যজিৎ নিজে অবশ্য ছবিটি দেখেন অনেক পরে, নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে, গোর্কি সদনের একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে। ঐদিনই অসুস্থতার পর সত্যজিৎ প্রথম বাড়ির বাইরে আসেন।

ঘরে-বাইরে : রাজনীতির প্রশ্ন ও কালচেতনা

সবুজপত্রে ঘরে-বাইরে যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল তখন থেকেই উপন্যাসটি ঘিরে নানা সমালোচনা হতে থাকে। লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবুজপত্রেই এক চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি এ কথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে।' স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে যে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বিবৃত হয় সেখানে লেখকের কালচেতনা গভীরভাবেই সক্রিয়। নিখিলেশ ও সন্দীপের মতাদর্শের দ্বন্দ্ব প্রকৃতই স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিতর্কের রূপায়ণ। এই বিতর্কে উদার মানবিকতা-বাদে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব মতামত ও মূল্যায়ন উপন্যাসের গতির মধ্যে, কাহিনীবিন্যাসের পর্যায়ক্রমে,

> নিখিলেশ ও সন্দীপের মতাদর্শের দ্বন্দ্ব প্রকৃতই স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিতর্কের রূপায়ণ

চরিত্রচিত্রণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। মহৎ শিল্পী হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসকে যেমন সময়োচিত করে তুলেছেন, তেমনি চিরায়তও করে তুলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পাঠককে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পাঠকের মতভেদ থাকা সম্ভব; কিন্তু গল্পকে মত বলে দেখবার তো দরকার নেই,

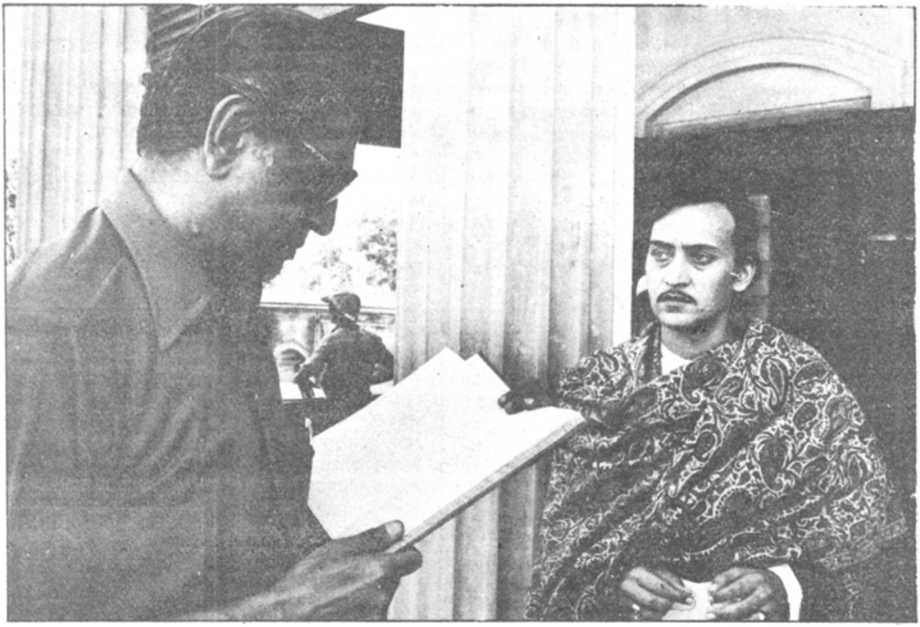

'ঘরে বাইরে' ছবির সুটিংয়ের পূর্বে সত্যজিৎ রায় নির্দেশ দিচ্ছেন ভিক্টর ব্যানার্জীকে। ছবিঃ নিমাই ঘোষ

গল্প বলেই দেখতে হবে।' কিন্তু মহৎ উপন্যাস এক অর্থে হচ্ছে জীবনেরই সমালোচনা – এই সমালোচনার গভীরতাই উপন্যাসের শিল্পগুণকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে, প্রাসঙ্গিক করে তোলে। ঘরে-বাইরে সম্পর্কে সত্যজিৎ বলেন যে এটি একটি প্রেমের উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। এর রাজনৈতিক থিমও আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, 'but it is important to understand it just the same. It is important in our present confused situation to make films of classics, just to inform people of what happened.' এ থেকে বোঝা যায় যে সময়ের চাপ সত্যজিৎ এড়াতে পারেন না, তিনি বোঝেন আপাতভাবে ঘরে-বাইরে উপন্যাসের রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও বর্তমান দেশজ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অতীতের অনুধাবন ও অনুশীলনের গুরুত্ব রয়েছে, কেননা, তা বর্তমানকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে – এই ইতিহাস-চেতনা সত্যজিতের পুরোপুরি রয়েছে। ঘরে-বাইরে তাই শুধুমাত্র শিল্পকর্মই নয়, অতীতের অনুশীলনও।

পোল্যাণ্ডের চিত্রপরিচালক আন্দ্রে ভাইদা ফরাসি বিপ্লব নিয়ে 'দাঁতো' (Danton) ছবি নির্মাণ করার পর ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়, পুণর্মূল্যায়ন হয় নেতাদের ভূমিকা, এমনকি ইতিহাস পাঠ্যসূচী ঢেলে সাজাবারও কথা ওঠে। অন্যদিকে ভাইদার ছবিতে পোল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রচ্ছন্ন ছায়াপাত সম্পর্কেও আলোচনা হয় – দেখানো হয় যে ফরাসি বিপ্লবের কাহিনী হলেও পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক পটভূমিতে ছবিটি অন্য ব্যঞ্জনা আনছে। সত্যজিতের 'সতরঞ্চ কি খিলাড়ি' নিয়ে এদেশে কিছু বিতর্ক হয়েছে, ইতিহাস প্রসঙ্গে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে – সচেতন দর্শকের কৌতূহলও জাগ্রত হয়েছে দেশজ ইতিহাস সম্পর্কে। ঘরে-বাইরের কাহিনীকাল খুব প্রাচীন নয়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বিকাশ ও তার সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ ঘরে-বাইরে উপন্যাসের চিত্ররূপদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মনোভাব গোপন রাখেননি, আর, ঘরে বাইরের চিত্ররূপে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতেই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নুতন মাত্রা যোগ করতে চেয়েছেন। মূলত: প্রেমের কাহিনী ঘরে-বাইরে – কিন্তু প্রেম তো নিরালম্ব শূন্যে হয় না, বিশেষ দেশকালের পটভূমিতেই তাকে বিকশিত হতে হয়। ঘরে-বাইরে ছবিটিকে যদি বিমলার আত্মানুসন্ধানের কাহিনী হিসাবে দেখি, তাহলে বলা যেতে পারে যে, বিমলা ঘরের বাইরে এসে নিজেকে নুতন করে জানে এবং সন্দীপের প্রেম ও স্বদেশী আন্দোলনের ছোঁয়া তাকে পরিণত করে তোলে ও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির মধ্যে দিয়ে সে তার জীবন-অন্বেষার বৃত্ত পূর্ণ করে। কিন্তু ছবিটিকে একটি রাজনৈতিক মানদণ্ডেও আলোচনা করা যেতে পারে।

নিখিলেশ ও সন্দীপ এই দুই চরিত্রের বৈপরীত্য শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের পার্থক্যই নয়, এখানে দুটি ভিন্ন মতাদর্শের দ্বন্দ্বও প্রকাশিত। সত্যজিৎ নিখিলেশ চরিত্রটি নির্মাণে উপন্যাসের মূল সংলাপ অনেকটাই ছেঁটে দিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য লেখা থেকে অংশবিশেষ সংলাপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত: নিখিলেশকে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বাহক করেছেন, অন্যদিকে সন্দীপ চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের হীনতা। এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে স্বদেশী আন্দোলনের সকল নেতাই সন্দীপের মতো লোভী ও স্বার্থপর ছিলেন, কিন্তু, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুবিধাবাদী, লোভী গোষ্ঠীর স্বরূপ সন্দীপ চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত। সত্যজিৎ

বোধহয় একটু নির্দয় হয়েই সন্দীপকে এঁকেছেন – আজকের দেশ ময় রাজনৈতিক শঠতা ও ভ্রষ্টাচারের অভিজ্ঞতাই হয়তো তাঁকে নির্দয় করেছে – সন্দীপ যেন এদেরই পূর্বপুরুষ।

ঘরে-বাইরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত করে আন্দোলনকে ধ্বংস করার ভারতীয় ঐতিহ্য চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ছবিতে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ভাঙন ও বিভেদের সূত্রানুসন্ধানের চেষ্টা ছবিতে এসেছে – বস্তুত, নেতারা আন্দোলন শুরু করেন, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখেন না। নেতৃত্ব দেন, কিন্তু বিচ্যুতিগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন না, যুক্তির পরিবর্তে আবেগই তাদের মূলধন, আদর্শের থেকে বড় ব্যক্তিগত স্বার্থ। ফলে চরম বিপদের মুহূর্তে তারা গা ঢাকা দেন। সন্দীপের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ত্রুটিগুলি তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষারই ফলশ্রুতি।

ঘরে –বাইরে সংলাপ প্রধান ছবি। দীর্ঘ–প্রায় দুঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের। সত্যজিতের ছবিতে সাধারণত সংলাপের প্রাধান্য থাকে না, দৈর্ঘ্যও হয় কম। এছবিতে পরিচালক কোনো চরিত্রের মুখেই মূল উপন্যাসের সংলাপ বিশেষ ব্যবহার করেন নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন করে তা লিখেছেন। ফলে যারা এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় গদ্যে আচ্ছন্ন তারা হয়তো অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। এছাড়া উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিচালক যে ধরনের স্বাধীনতা নিয়ে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন করেন–ঘরে-বাইরের ক্ষেত্রে সে স্বাধীনতাটুকু হয়তো নেই কট্টর সমালোচক দিতে চাইবেন না। 'চারুলতা' সম্পর্কিত বিতর্কের স্মৃতির সূত্রেই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বলেই হয়তো এ ছবি নিয়েও অনুরূপ বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, বিতর্ক এদেশে সাধারণত তীব্র হয়, কিন্তু গভীর হয় না। অবশ্য বিতর্কের সূত্রেই আমরা সত্যজিতের কয়েকটি অনন্য আলোচনা পেয়েছি–এটা আখেরে আমাদেরই লাভ।

ঘরে–বাইরে উপন্যাস হিশাবে পাঠকের কাছে এবং চলচ্চিত্র হিশাবে দর্শকের কাছে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। কেননা, আপাতভাবে পাঠক দর্শকের ভালোলাগা–মন্দলাগার বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে যথাযথ মর্যাদায় শিল্পানুশীলন। ঘরে–বাইরের চিত্ররূপের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ সচেতনভাবেই এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন – যেমন করেছিলেন 'সতরঞ্চ কি খিলাড়ি' ছবিতে। ফলে ছবিটি প্রধানত দর্শকের ভাবাবেগকে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিকেই জাগ্রত করবে। ঘরে–বাইরে দেখতে গেলে দর্শকের সচেতন, মুক্ত মন নিয়ে যেতে হবে, হতে হবে সতর্ক ও ধৈর্য্যশীল। এছবির যথার্থতা উপলব্ধি করতে হলে সঠিক কালচেতনার আলোকেই ছবিটিকে বিবেচনা করতে হবে।

সুবিখ্যাত কান, চলচ্চিত্র উৎসবে ঘরে বাইরে পুরস্কৃত হয় নি–এই যুক্তির সূত্রে ছবির শিল্পগুণকেও খাটো করে দেখতে চাইবেন কেউ কেউ। তবে এপ্রসঙ্গে দক্ষিণভারতের নামী পরিচালক আদুর গোপালকৃষ্ণণের উক্তি বোধহয় চমৎকার ভাবে প্রযোজ্য, 'কোনো ছবি কোনো চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে দিয়ে ছবির মান সম্পর্কে নয়, বিচারকদের মান সম্পর্কেই ধারণা পাওয়া যায়।'

রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মনোভাব গোপন রাখেন নি, আর ঘরে–বাইরের চিত্ররূপে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নুতন মাত্রা যোগ করতে চেয়েছেন

'ঘরে বাইরে' ছবিতে জেনিফার কাপুর ও ভিক্টর ব্যানার্জী। ছবিঃ নিমাই ঘোষ

ঘরে-বাইরে : দর্শকের দায়িত্ব

ঘরে-বাইরের চিত্ররূপ দেওয়া ছিল দুঃসাধ্য কাজ। মূল উপন্যাস ডায়ারির আঙ্গিকে লেখা। বিমলার আত্মকথা, নিখিলেশের আত্মকথা ও সন্দীপের আত্মকথা বারবার ফিরে আসে। কিন্তু এই আঙ্গিকেও উপন্যাসের কাহিনী সাবলীল-ভাবেই এগিয়ে চলে। সত্যজিৎ ছবিতে উপন্যাসের ফর্ম ব্যবহার করেন নি। চিত্রনাট্যে তিনি মোট চারটি ভাগ রেখেছেন। প্রথম অংশে বিমলা আসে – এই অংশের সমস্ত শটেই বিমলাকে দেখা যায় অফ ভয়েসে তার কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। একটি ফেড আউট-ফেড ইনের সাহায্যে দ্বিতীয় অংশটিকে আনা হয়। এখানে নিখিলেশের প্রাধান্য – সমস্ত শটেই সে আছে। দ্বিতীয় ফেড আউট ফেড-ইনের সাহায্যে সন্দীপের অংশটি আসে। প্রতিটি অংশে সেই চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাকে দেখানো হয়, চরিত্রের মনোজগৎ উন্মোচিত হয়। একেবারে শেষ অংশে আমরা পাই পরিচালকের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার বিশ্লেষণ – এখানে কোনো বিশেষ চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না, কাহিনীর ধারাবাহিকতাকে না ভেঙেই পরিচালকের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীর পরিসমাপ্তি টানা হয়।

ছবিটি সংলাপ প্রধান। দীর্ঘ, প্রায় দু-ঘন্টা দশ মিনিটের। চিত্রনাট্যে নূতনত্ব ও বিশেষ স্ট্রাকচারটি দর্শকের কাছে অভিনব মনে হবে। তাছাড়া প্রতিটি চরিত্রের ক্ষেত্রেই সত্যজিৎ উপন্যাসের মূল সংলাপ বিশেষ ব্যবহার করেন নি, ফলে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় গদ্যে আচ্ছন্ন তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ছবি গভীর ভাবাবেগে আলোড়িত করার ছবি নয়; সত্যজিৎ আবেগ নয়, দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তিকেই জাগ্রত করতে চেয়েছেন। দর্শককে মনে রাখতে হবে যে 'ঘরে-বাইরে'তে সত্যজিৎ এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন, যেমন করেছিলেন সতরঞ্চ কি খিলাড়ি ছবিতে। এ ছবি দেখতে গেলে ধৈর্য চাই, চাই সচেতন, মুক্ত মন। সহজেই বোঝা যায় যে ঘরে-বাইরে এখানে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিতর্কের সৃষ্টি করবে। কারণ সকলকে খুশি করবার ছবি নয় ঘরে-বাইরে। □

> **অতীতের অনুধাবণ ও অনুশীলনের গুরুত্ব রয়েছে, কেননা তা বর্তমানকে বুঝতেও ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে –এই ইতিহাস চেতনা সত্যজিতের পুরোপুরি রয়েছে। ঘরে বাইরে তাই শুধুমাত্র শিল্পকর্মই নয়, অতীতের অনুশীলনও।**

'ঘরে বাইরে' ছবিতে স্বাতীলেখা চ্যাটার্জী ও সৌমিত্র চ্যাটার্জী। ছবিঃ নিমাই [illegible]

বহুমুখী সত্যজিৎ

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

কেবল চলচ্চিত্র নয়, সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা বহুমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। তার কিছু কিছু অনেকেই জানেন। বিভিন্ন পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধে অনেকেই এ সব বিষয় ধরতে চেয়েছেন। এছাড়াও বেশ কিছু বিষয় রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রবন্ধের আকারে না লিখে এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে এরকমই কিছু তথ্য।

☐ কিশোর বয়সে একবার সত্যজিৎ রায় ইংল্যান্ডের 'বয়েজ ওন পেপার' পত্রিকায় ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠিয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন।

☐ এগার/বারো বছর বয়েসে বড়দের 'ক্রশ-ওয়ার্ড-পাজল' সমাধান করতে সত্যজিতের কোন অসুবিধে হত না।

☐ ন'বছর বয়স থেকে জর্মানির বিখ্যাত রাগ সঙগীতের মধ্যমণি, বিটোভেন ছিলেন তাঁর 'হিরো'। বিটোভেন-এর সঙগীতের 'স্কোর' ছিল তাঁর 'বেডসাইড রিডিং'।

☐ যৌবনকালে একটা পুরো সিমফনি তিনবার শুনলেই তা মুখস্থ হয়ে যেত।

☐ একবার দেখেই ভালো লাগা বিদেশী ছবির 'টাইটেল-মিউজিক' নির্ভুলভাবে শিস দিয়ে বাজাতে সত্যজিতের অসুবিধে হয় না।

☐ সত্যজিৎ বি. এ. পাশ করেছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। তাঁর বিষয় ছিল অর্থনীতি।

☐ সত্যজিতের অভ্যেস ছিল কাহিনীর চিত্রনাট্য করা। 'উদয়ের পথে' ছবি করার পর বিমল রায় যখন 'ফসিল' ছবির কথা ঘোষণা করেন তখন সত্যজিৎ ফসিলের চিত্রনাট্য লিখে নিয়ে ওঁর কাছে যান। প্রায় পাঁচ/ছ' ঘন্টা বসিয়ে রাখার পর বিমল রায় চিত্রনাট্যটি না পড়েই সত্যজিৎকে চলে যেতে বলেন।

☐ সত্যজিৎ প্রথম চাকরিতে ঢোকেন 'ডি জে কিমার' নামে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় একজন ভিসুয়ালাইজার হিসাবে। তাঁর মাইনে ছিল ৬৫ টাকা বেসিক আর ৮০ টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়্যান্স। মোট ১৪৫ টাকা।

☐ ডি জে কিমারের আর্ট ডিরেক্টর হয়ে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন ১৯৫০ সালে। গিয়ে দেখেন সেখানকার আর্ট ডিরেক্টর মি. বল সত্যজিতের করা বিজ্ঞাপন তথা পোস্টারগুলো নিজের নামে চালাচ্ছেন। রাগে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।

☐ পঞ্চাশের দশকে সুব্রত ব্যানার্জি সম্পাদিত 'সোসাইটি ক্লোজ আপ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে সত্যজিতের জন্য একটি নির্দিষ্ট 'কলম' থাকত। যেখানে উনি চলচ্চিত্রের সঙগে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির কার্টুন আঁকতেন।

☐ চল্লিশের দশকের শেষ দিকে বিকাশ রায় রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন নিউ এম্পায়ারে। নাটকটির মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন সত্যজিৎ রায় ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত।

□১৯৫০ সালে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে বিভিন্ন দেশের বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানে কুড়িটি দেশ থেকে বাছাই করা বইয়ের মলাট আনা হয়েছিল। ভারতবর্ষের মাত্র চারটি বই সেই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। তার প্রত্যেকটিরই প্রকাশক সিগনেট প্রেস এবং প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন সত্যজিৎ রায়।

□ ১৯৬০ সালের আগে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই সামান্য। ভালভাবে বাংলা লিখতেও পারতেন না। সিগনেটের 'ডি কে' একবার তাঁকে একটি বাংলা বই উপহার দিয়ে লিখে দিয়েছিলেন 'বাংলা সাহিত্যে শূন্য জ্ঞানী মাণিককে'।

□ ১৯৬১ সালে নব পর্যায়ে 'সন্দেশ' পত্রিকা বেরোবার পর সন্দেশের জন্য তিনি প্রথম বাংলা লিখতে শুরু করেন।

□ বর্তমানে সত্যজিতের বই সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রায়ই 'বেস্ট সেলার' তালিকার শীর্ষে থাকে।

□ ১৯৮৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'আমার সংসার চলে প্রধানত বই লেখার টাকায়।'

□ হিন্দি, তেলেগু, মালায়লাম, ইংরাজি, ফরাসী, জর্মানি, ফিনিস প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে সত্যজিতের লেখা বই।

□ সত্যজিৎ রায়ের লেখা গল্প নিয়ে রেডিওতে বেতার নাটকের সংখ্যা ছয়।

□ মহাভারতকে দুটো ভাগে ছবি করবার তাঁর খুবই ইচ্ছে ছিল। ভেবেছিলেন তোশিরো মিফুনকে নিয়ে কাজ করবেন। ছবিটা হবে একটা ইন্টারন্যাশনাল কাস্টিং করে। রঙিন সে ছবি আজও হয়ে ওঠে নি।

□ 'আপনার জীবনের স্মরণীয় সুখের মুহূর্ত কোনটি ?' প্রশ্নের উত্তরে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, "যখন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের আন্তর্জাতিক জুরীদের প্রধান ঘোষণা করলেন – অপরাজিত উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।"

□ 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্র সম্বন্ধে সত্যজিতের বক্তব্য যে তিনটি কাহিনী চিত্র তৈরি করতে যে পরিমাণ কাজ বা সময় দরকার সেই পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে এ ছবিটির জন্য।

□ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চলচ্চিত্র তৈরির সময় Peking Robin একটি পাখির ডাকের শব্দের প্রয়োজন ছিল। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও সে ডাকের শব্দ না পাওয়ায় তিনি শিস দিয়ে সেই শব্দ রেকর্ড করেন।

□ সত্যজিৎ রায়ের করা 'Ray Roman' নামে একটি টাইপ ফেস এখনও একটি আমেরিকান ফার্ম তাঁদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে। এ ছাড়াও সত্যজিৎ আরো তিন ধরনের ইংরেজি টাইপ ফেস তৈরি করেছিলেন।

□ পাশ্চাত্য রাগ সংগীতের রেকর্ড সংগ্রহ ছাড়াও সত্যজিতের প্রিয় সখ দেশী বিদেশী 'ইনডোর গেমস' সংগ্রহ।

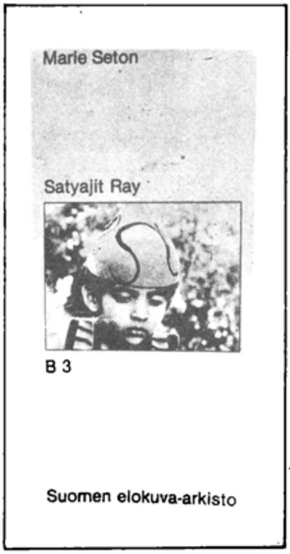

□ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে' ছবির বিখ্যাত গানগুলি লেখা ছাড়াও চিড়িয়াখানা ও দেবীর জন্যও সত্যজিৎ গান লিখেছিলেন। তাঁর লেখা 'দেবী'র শ্যামা-সঙ্গীতটি গেয়েছিলেন এক মুসলমান গায়ক।

□ পথের পাঁচালী ছবির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮২ সালের জুলাই পর্যন্ত লাভ করেছেন ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। এই ছবির পারিশ্রমিক হিসেবে সত্যজিৎ পেয়েছিলেন ৩ হাজার টাকা।

□ ইন্দিরা গান্ধী বেশ কয়েকবার কয়েকটি ছবি পরিচালনা করার প্রস্তাব দেন শ্রী রায়কে। ১৯৬১ সালে 'সোসাল ওয়েলফেয়ার', ১৯৬২ সালে 'কনটেমপোরারি ইন্ডিয়া', 'জওহরলাল নেহেরুর জীবনী' এবং এমারজেন্সীর ওপর একটি তথ্যচিত্রের প্রস্তাব সত্যজিৎ বাতিল করে দেন। প্রতিবারেই সত্যজিতের উত্তর ছিল 'না, বিষয়গুলির প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই।'

□ আমেরিকার বিখ্যাত কবি এ্যালেনস গীনস বার্গ সত্যজিতের সঙ্গে দেখা করতে যান। গীনস বললেন চলচ্চিত্র নিয়ে আর সত্যজিৎ সারাক্ষণ কথা বলে গেলেন আমেরিকার আধুনিক কবি ও কবিতা নিয়ে।

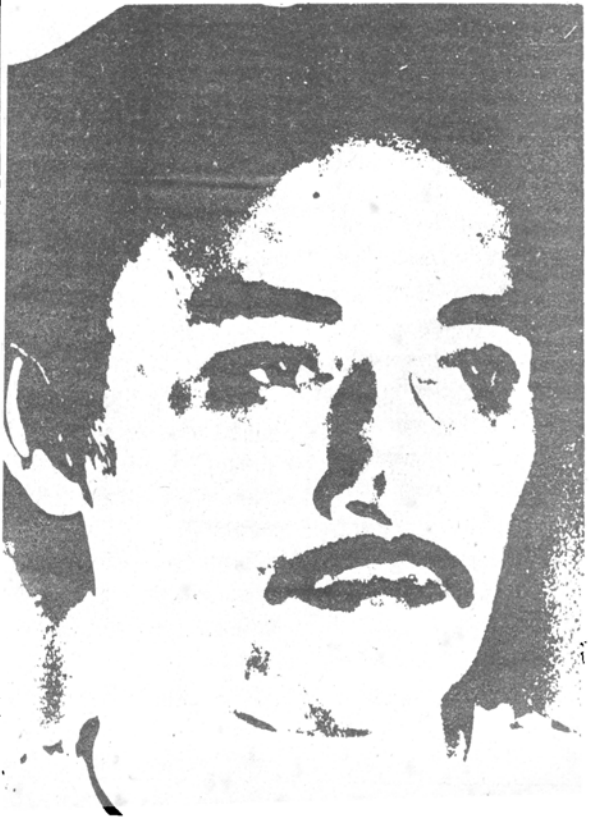

Stareotypes No : 2

BIKASH — *in his elements*

Satyajit Roy

ঘরে বাইরে : লা কেলজিও

লে নউবেল অবজার্ভেচিওর

আপনি যদি আমায় বলতে বলেন কেন আমি ঘরে বাইরেকে পছন্দ করি, এক অসাধারণ সুন্দর ছবি সত্যজিত রায়ের, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস; যে চিত্রটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে 'কান' শেষ মুহূর্তে এসেছে এবং সবাইকে মুগ্ধ করেছে। নীরব অপেক্ষার মূল্যবান উপহার দিয়েছে সত্যজিত রায় এবং ক্ষতিপূরণ করেছে উইম ওয়েনডারের।

অনেক কিছুই বলবার আছে ঘরে–বাইরে সম্পর্কে কোনখান থেকে যে শুরু করব সেটাই বুঝে উঠতে পারছিনা। যাই হোক শুরুতেই দেখান হয়েছে রাত্রিবেলা, এক জ্বলন্ত দীপশিখা, বেদ অনুসারে যা ধ্বংসের প্রতীক সাথে সাথে নবজন্মেরও। অথবা ঘর, যেখানে আমরা প্রবেশ করছি খুব ধীরে, অন্তহীন, পৃথিবীর বাইরে। যে ঘর তৈরী করে প্রত্যেক দম্পতিই, পৃথিবী তাঁদের রক্ষা করে, আশ্রয় দেয়, যা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে খুব সহজে, মুখে ফুটে উঠবে এক আতঙ্কের ছাপ। আমি পছন্দ করি বাড়ির এই নির্জনতাকে, যে আঘাত আছড়ে পড়বে লোভাতুর ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে: অশান্তি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়াতে লাগল খুব দ্রুত গতিতে পৃথিবীব্যাপি, স্বাধীনতার জন্য যা অপরিহার্য। আমি পছন্দ করি সেই জায়গা যা পুরোপুরি বর্তমান। এই দেওয়ালের মধ্যে ঘরের অনিশ্চিত বন্ধন মুক্ত করে বেড়িয়ে আসবার অনুসন্ধান চালাচ্ছে বিমলা যা প্রতিফলিত হয়েছে আয়নাতে, কল্পনার বাস্তব। তাঁর ঘরের মধ্যে অন্ধকার রেলিঙ পেড়িয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে, বিমলা তাকিয়ে আছে সন্দীপের দিকে বাইরে, যেখানে জনগণের সামনে জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছে। যখন সে স্বাধীনতার কথা বলছে, বিমলা শুনতে পাচ্ছেনা, কেমন করে সে শুনবে? তার সামনে যে প্রাচীরের বাঁধা। সন্দীপ তাঁর কাছে জগৎ, সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে তাঁর কাছে, বাইরের আলো তার কাছে বয়ে এনেছে, তাঁর শব্দের, শক্তির, সৌন্দর্যের। 'কৃষ্ণর বাঁশীর আওয়াজ শুনলে কেউ পারবে রাধাকে রুখতে?' বিমলার কাছে তেমনি সন্দীপ, পৃথিবীতে ভগবানরূপে প্রেরিত, যাঁর স্থান মানুষেরও ওপরে। বাংলাকে পাপমুক্ত করতে, ব্রিটিশকে ভারতত্যাগ করাবার জন্য তাঁর একটাই মন্ত্র 'বন্দেমাতরম' যা পর্বতমালাকেও কাঁপিয়ে তুলেছে, তাঁর বাক্য মন্ত্রপূত, তার ভালবাসা হচ্ছে সত্য। সে চিন্তাই করতে পারছেনা রাধা কেমন করে বয়ে নিয়ে যাবে তাঁর প্রেমের বেদনা, কে উপস্থাপন করবে তার মনের দেবতার কাছে? সে সব কিছু দিয়ে দিতে রাজী আছে তাঁর জন্য, তার রাজ্যকে বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করবার জন্য, সব কিছুই ত্যাগ করতে রাজী আছে (পড়াশুনা, ভবিষ্যত, পরিবার) অমূল্য তার নেতার পথ অনুসরণ করতে।

আমার ভাল লেগেছে, যখন বিমলা স্বামীকে সহযোগিতা করার জন্য অন্দরমহল ত্যাগ করে বাইরে বেড়িয়ে এসেছে; ক্যামেরা তাদের পেছন থেকে নিয়েছে নিখিল এবং বিমলা বারান্দা ধরে হাঁটছে, যেখানে বিমলা এবং পৃথিবী একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে, বিমলার শিশুসুলভ সব আশা–আকাঙখা, নিখিলের প্রতি অস্বস্তি, তাঁর একমাত্র তৃপ্তি স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছান যেটা সে পেয়েছে সন্দীপের কাছে।

বিস্ময় যে অস্থিরতা তা সন্দীপের ঘর পর্যন্ত এসেছে, যা বয়ে এনেছে গন্ডগোল, অবিচার, দাঙগা। বাংলায় হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের উস্কানি, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অগ্রগতি। কিন্তু সত্যজিত রায় এই সব দেখাতে চাননি, যেটা চেয়েছেন যা আমরা জানিনা, ব্যতিক্রম সেখানেই। যেমন বিমলা, আমরা বিশ্বকে জানি সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে, এক দেশ থেকে আর এক দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে, সন্দীপ ও তাঁর অনুগামীদের চুক্তির মাধ্যমে। আমাদের উদ্বেগ এবং অস্বস্তি একই সঙ্গে বাড়ছিল আমরা যেহেতু বাস্তব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নই, সেটাই আমাদের অপারগতা। কুৎসা বুদ্ধি যথেষ্ট পীড়াদায়ক, দুরে জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড যা মুখে ফুটে উঠেছিল।

তুমি বলতে পার বাক্যবায় বেশী হয়েছে, কথোপকথন তোমাকে উত্তেজিত করবে। কিন্তু যা পেয়েছি বা তৈরী করতে পেরেছে (নাটকীয়ভঙ্গি বাইরের ঘরের) দৈন্যতা অপেক্ষা কম মূল্যবান।

কবি জয়দেবের ঐশ্বরিক ভালবাসার গানের মধ্য দিয়ে বিমলা ও সন্দীপের প্রীতির সম্ভাষণ তাঁরই আবিষ্কার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাষা অনুচ্চারিত থাকায় বিমলার প্রতি ভালবাসা নিখিল জানাতে

'ঘরে বাইরে' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রপ্রমিত রায়

পর্দায় যে চলচ্চিত্র আমরা দেখি তা তৈরি করতে অন্ততঃ তিনশো বিভিন্ন শিল্প আর কর্ম প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। হাজার হাজার কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন এই সব ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের কাজে। ছবি দেখার সময় তাঁদের অদৃশ্য হাত কারো দৃষ্টিতে না পড়তে পারে, কিন্তু ছবির প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে তাঁরা উপস্থিত। তাঁরাই চলচ্চিত্রের স্রষ্টা।

জাঁ রেনোয়া লেভি

াদ্রকদের চোখে

পারেনি। শব্দ মাধুর্য এবং তার ব্যঞ্জনায় বিমলা বুঝতে পারলনা প্রকৃত ঐশ্বরিক ভক্তি কিসের মধ্যে নিহিত।

এত বাক্য ব্যয় করেও সত্যকে সেখানে গোপন রেখেছে। সত্যজিতের ছবিতে পৃথিবীময় যে গন্ডগোল, অশান্তি, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া সেই দুর্বলতা ছিলনা। ভাষার যে দুটো প্রকৃতি সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে, ভাষার যে আনন্দ, ভাষার যে ক্ষমতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য ঘৃণিত, এবং অপরদিকে, ভাষার হৃদয়, ভাষার উজ্জ্বলতা, মানুষের চাহনি যা মুখে ফুটে উঠেছে, যেটা মানুষের কাজের মাধ্যমে বলে দিয়েছে। শব্দই এখানে দর্পন যেটা প্রতিফলিত হয়েছে, যার দিকে দৃষ্টি ছিল প্রত্যেকরই। সন্দীপ, ভন্ড ভবিষ্যৎবক্তা, বিমলাকে রাজী করাতে পেরেছিল গৃহত্যাগ করতে যেমন নিখিল করেছিল। 'তার মন ঘরের বাইরে'। সন্দীপ বক্তৃতার মাধ্যমে দাঙ্গা বাধিয়েছিল এবং সেটা ধরে রেখেছিল। যেটা কোনও কাজেই আসেনি না পেরেছে গোপন রাখতে না পেরেছে মুক্ত করতে। সমগ্র বিশ্বে সমস্ত ক্ষমতাই বাংলার, যেমন ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের। কিন্তু পৃথিবী যখন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, কেউ কি পারবে তার ঘর রক্ষা করতে?

সত্যজিত রায় আমাদের দেখাতে পারেনি বাইরের বাস্তবটাকে। মুখের ওপর অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তাঁর দৃষ্টি তাঁর অভিব্যক্তি ইঙ্গিত বহন করে যা অনেক সময় চাপা পড়েছে আনন্দের মুখোশে, নিঁখুত পরিচালিত হয়েছে স্ক্রীন ভাঁজ হওয়ার দৃশ্যে আগুন, অকল্পনীয়। ব্রেসনকে বাদ দিলে (বিশেষভাবে 'পিকপকেট' এবং 'মানি) খুব কম সংখ্যক চিত্র পরিচালকই আছেন, যে অনেক কিছুই বলতে পারেন অনেক কিছুর সাহায্যে সঠিকভাবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ করতে হবে। যা হয়, তা হচ্ছে সাধারণ মুখভঙ্গিমা, দেহের, খুব মন্থর অভিব্যক্তি। অসিম দেওয়ালের খাঁজগুলোকে খুলে ধরা হয়েছে মাঝে-মধ্যে মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুৎ ঝলকানি, জানলার মধ্য দিয়ে বা দরজা দিয়ে, ভেতরের দৃশ্য, একটা সিঁড়ি বা বিক্ষুব্ধ জনতার দৃশ্য যেন বাস্তবতার প্রতীক। যেন এটাই একমাত্র ভাস্কর্য শিল্প যা বাস্তব রূপ দিতে পারে চলচ্চিত্রের ভাষায় তা যাই হোক না কেন শব্দের অথবা ধারণার অভিব্যক্তি; কিন্তু আমাদের অন্তর্ধারনাকে চঞ্চল করে তোলে।

টেগোরের কাজের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল, সত্যজিত রায় প্রত্যাখ্যান করেছে চিত্রের-আনন্দকে, দৃশ্যের পর দৃশ্যে ধরা হয়েছে ক্যামেরার ফিল্মে করুণ মুখের ছবি, দেহের অভিব্যক্তির। নিখিল-দ্বিধাগ্রস্ত, নিশ্চুপ, যন্ত্রণায় ভুগছে-সে তার ভবিষ্যত উপলব্ধি করে; সন্দীপ পলায়নপর, অমূল্য বর্তমান।

বিমলার মুখে ফুটে উঠেছে অনুসন্ধানীর দৃষ্টি, বিশ্বকে বোঝবার চেষ্টা করছে, নিজেকে প্রশ্নের প্রাক মুহূর্তে আয়নার সামনে, তাঁর উত্তেজিত হাত সন্দীপের কাঁধে, তাঁর ভবিষ্যতের বিভ্রান্তি চরিতার্থ-তার পূর্বে।

সত্যজিত আমাদের না দিতে পেরেছেন রাজনৈতিক দু:সাহসিকতা না পেরেছে বিশ্বদর্শনকে প্রকাশ করতে। এর অনুভূতি খুবই সরল, বিমলার অনুভূতি একজনের প্রতি খুবই উজ্জ্বল। অতিমানবিক অনুভূতি নিখিলের তাঁর স্ত্রীর প্রতি। অমূল্যের অনুভূতি দেশমাতার মুক্তির জন্য। এটাই হচ্ছে খাঁটি সত্য, এটাই কঠিন বাস্তব একজন মানুষের পৃথিবীর ওপর একাধিপত্য। সন্দীপ ভুলে গিয়েছিল নিজের সম্বন্ধে যে সে হচ্ছে অযোগ্য, নিজেকে ছাড়া কারোকেই ভালবাসতে পারেনা, যে কারণে সে নেতা হতে পারেনি এমনকি সত্যিকারের মুক্তি-যোদ্ধা। টাঁকা-পয়সা এবং অসাধুতা তাকে উত্তেজিত করেছিল যে, বিশেষ কারণে খুব তাড়াতাড়ি তাকে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে হয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছিল যে বিমলা তাকে ভালবাসে যেটা বুঝেছে অনেক দেরীতে যখন তার বাড়ী তাকে রক্ষা করেছে।

সত্যজিত খুঁজে বেড়িয়েছে অনুভূতির আদর্শকে এবং এক মেল বন্ধন করতে চেয়েছেন জন্মের সঙ্গে জাতের। অপু জ্ঞানার্জনের জন্য যুদ্ধ চালিয়েছিল এটা সম্পূর্ণ তার বিপরীত, পৃথিবীতে সে পদচিহ্ন

* রায়

ছবিঃ নিমাই ঘোষ

রাখতে চেয়েছিল।

মহারাজা নিখিলের লক্ষ্য, আদর্শবোধ তাকে ঘিরে রেখেছিল। ভবিষ্যতদ্রষ্টা লিখেছে মিথ্যা এবং অবিচার দুর্বল শ্রেণীকে চালাচ্ছে যা হচ্ছে ধর্মের এক রহস্য, পৃথিবীর উৎস, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল তাঁর স্বামীর কাছ থেকে কে বা যন্ত্রণা ভোগ করেছিল আর কে বা পেছনে ছিল। কাল হচ্ছে শাশ্বত যা পরিণত হয়েছে অনুভূতিতে, ভবিষ্যতের প্রকাশ তার মানুষের ভাষাতে। প্রত্যেক সময়েই এর অভিব্যক্তি রয়েছে, কালের প্রকাশও সমভাবে নিষ্ঠুর সমভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে। যাকে একটি সুরে বাঁধা গেছে নিখিলের সঙ্গে বিমলার পুনর্মিলন, যেটার খুবই প্রয়োজন ছিল। বিস্ময় এক দাবানল, শয়তানেরা বপন করে চলেছে ধ্বংসের বীজ এবং নিখিল তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলেছে।

এই হচ্ছে সারাংশ কেন আমার ভাল লেগেছে ঘরে-বাইরে আমি এটা লিখেছি, তোমাদের কাছে খুব বেশী একটা ব্যাখ্যা করতে পারিনি, কিন্তু আমি নিজে অনুভব করেছি। চিত্রটি পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়, এটা সত্য। এটা হচ্ছে দু:খবাদীর প্রতীক, যে কারণে গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে ভাগ্য দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুণ। চিত্রটি খুবই মন্থর, অপুষ্টিলজির চাহিদা এবং অপছন্দের থেকে, রে কোনও সোজা পথ তৈরী করতে পারেনি পৃথিবীব্যাপি। কিন্তু আমরা যখন প্রবেশ করব-খুব ধীর গতি, নিখিল ও বিমলা একে অপরকে সাহচর্য দান করছে।

আমি আশা করব যে আমার এই চিত্র সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা তোমাদের মানসিক পীড়ার কারণ হবেনা। কানের সে দিনের কথা আমি কোনও দিনও ভুলবনা যেদিন আমি ছবিটি দেখেছি এবং আমি সত্যি ভালবেসেছি ঘরে-বাইরে চিত্রটিকে। □

সিনে সিন পত্রিকার সৌজন্যে

ঘরে বাইরে

জন পিম

পূর্ববঙ্গ ১৯০৭ খৃঃ, বিয়ের দশ বছর কেটে যাওয়ার পর সংসারের প্রতি ক্লান্ত হয়ে উঠেছে শুকসায়রের মালিক নিখিল চৌধুরী। তাঁর স্ত্রী বিমলাকে হিন্দু রীতি লঙ্ঘন করতে তিনি সম্মত করেছিলেন এবং ভৃত্যদের ভীতি-বিহ্বলতাকে তুচ্ছ করে তার বিধবা শ্যালিকাকে নিয়ে নির্জন পুরস্ত্রীবাসভবন থেকে চলে গেলেন। কিছুটা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা এবং কিছুটা তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য বিমলাকে সে তার বঙ্গভঙ্গের নেতা বলে আখ্যাত বন্ধু সন্দীপ মুখার্জীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সন্দীপ খুব তাড়াতাড়ি তার মতাদর্শে অনুপ্রাণিত করল বিমলাকে এবং নিখিলের বাড়িতে স্থান পেল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্তক যারা তারা নিখিলের খোঁজ করতে লাগল, তখন বিমলার মনে সন্দেহ উঁকি মারতে লাগল যে, সত্যিই নিখিল এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কি না। এই আন্দোলন যখন কিছুটা স্তিমিত হ'ল তখন নিখিলের জমিদারীর মধ্যে কিছু মুসলমান ব্যবসায়ীকে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রচেষ্টায় সে ভীতিপ্রদর্শন করছিল, তখন তাঁরা নিখিলের শরণাপন্ন হ'ল। ইতিমধ্যে বিমলা সন্দীপের প্রেমে পড়েছে, নির্বোধের মত রাজদ্রোহের জন্য টাকাপয়সা সাহায্য করছে। এইসব ব্যাপারে নিখিলের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, তিনি তাঁর স্কুল শিক্ষকের সাহায্যে সন্দীপের দুষ্কর্মের জন্য চলে যেতে বলেন, যাতে শান্তি রক্ষা হয়। ইতিমধ্যে বিমলাও তার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিল কারণ সন্দীপ তার কাছ থেকে ৫০০০ টাকা নিয়েছিল, তার প্রয়োজন ছিল ৩৫০০ টাকার। বিমলা তার অলঙ্কার বিক্রি করবার জন্য তাঁদের অনুচর অমূল্যকে দিয়েছিল যাতে নিখিলের টাকা প্রত্যর্পণ করতে পারে। বিমলা, নিখিলের কাছে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করেছিল এবং ক্ষমাও পেয়েছিল। অমূল্য এর মধ্যে চাকনার তোষাখানায় একজন রক্ষীকে খুন করে সেই টাকাটা সন্দীপকে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সন্দীপ ঐ সোনাদানা এবং টাকাপয়সা ফেরৎ দিয়ে রংপুরের দিকে রওনা হ'ল। নিখিল কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শান্তি স্থাপনের জন্য সে আগের মত সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু পরের দিন

'ঘরে বাইরে' ছবিতে ইন্দ্রপ্রমিত রায় ও অন্যান্যরা

ছবিঃ নিমাই ঘোষ

তার দেহ বাড়ীতে আনা হ'ল।

বিমলা তার ইংরেজী শিক্ষয়ত্রী কুমারী গিলবির কাছে একটি গান শেখেছিল। এই গানটি সে প্রায়শই গাইত যতক্ষণ না একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। টেগোরের ঘরে বাইরে সত্যজিতের খুবই ভালবাসার বস্ত হিসেবে গত তিরিশ বছর ধরে রেখেছিল। শ্রবণেন্দ্রীয় ধরে রাখে গানের দুঃখের মুহূর্তকে। পরিচালকের ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে পৃথিবীর সৌন্দর্য, অবলুপ্ত হয়েছে দুরারোগ্য নিষ্ঠুরতা।

সত্যজিতের সৌন্দর্য উপস্থাপনের যে বাচনভঙ্গী, কলা পরিচালক হিসেবে তাঁর দৃষ্টি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি অসাধারণ। গতানুগতিক চিত্র হচ্ছে জমিদার নিখিল, চরিত্রটি করেছেন ভিক্টর ব্যানার্জী; বিশেষ করে অভিনেতা হিসেবে সহজেই বীতশ্রদ্ধ, মানুষ হিসেবে শতকরা একশভাগ খাঁটি, বিষয়কে ঘিরে সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছিল শান্তি, বিস্তৃত ঘরের গোপনীয়তা, প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং এক অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী। তাঁর একমাত্র দুঃখ, এর প্রকাশ তাঁর পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা ও সামাজিক সম্পর্কে, ঘটনার শুরু সেখান থেকেই সেই ধারা এক জটিল আকার ধারণ করেছে। এটাই রায়ের একমাত্র অক্ষমতা; সে তার গৃহ ত্যাগ করল, পৃথিবীর থেকে বহুদূরে তাঁর বন্ধু সন্দীপ তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, যে কারণে সে আনন্দিত; তাঁর চোখে প্রকাশ পেয়েছে অন্য আর এক জিনিষ। সে তাঁর জমিদারীতে এক কারখানা খুলেছে, স্বনির্ভরতার পরীক্ষানিরিক্ষা, কিন্তু যে সাবান সে তৈরী করল সেটা কোনও কাজেই এল না, স্বদেশী তার জন্য নয়। যাই হোক, সে এখনও উপকৃত, সেখানে নিশ্চই কিছু আছে যে সুযোগ সন্দীপ দিয়েছিল। সে দৌড়ে ঘরে ঢোকে, বিমলার ফ্রেঞ্চ সুগন্ধির একটি বোতল তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে এই সুগন্ধি কি তাদের শক্তি যোগাবে। ছবির চরম মুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সম্ভাব্য ঘটনাগুলি বিতর্কিত হয়ে পড়ছে (রায়ের বক্তব্য যেন প্রত্যেকের সরল হৃদয়ের আর্তিঃ সম্ভাব্য জীবন সম্পৃক্ত, এই মঞ্চে মিথ্যা অজুহাতের একমাত্র উদাহরণ যা সত্যিই সংক্ষিপ্ত), এটা খুবই নিশ্চিত, দেরীতে হলেও ছেদ টানা হয়েছে ভাগ্যের ওপরে।

ঘরে বাইরে একটি শান্ত ধীর কাজ, যার বিষয় টেনে নিয়ে যাবে খুব সহজে অথবা প্রত্যেক মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়, যেমন বলা যায় 'চারুলতা'। রায়ের অধিকাংশ ছবির একটা মিল লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে গভীর বস্তুটি তৈরি হয়েছে এখানেই। এই গল্পের কিছু ঘটনা, অসাধুতার যে ব্যবস্থা, সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘোষণা, যেটা খুব হাল্কাভাবে দেখান হয়েছে; এবং একটি ঘটনা, সাব-ট্রেজারী আক্রমণের পরিকল্পনা যদিও খুব ন্যক্কারজনক (প্রমাণিত, রায় এখন পর্যন্ত যত কাজ করেছেন, এই কাজ তাঁর সুনাম ক্ষুণ্ণ করবে)। অন্যদিকে, সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন যেসব জায়গা যেখানে বিমলা শুনছে সন্দীপ জনগণের সামনে প্রথম ভাষণ দিচ্ছে, এক অসাধারণ মুহূর্ত, নিখিলের জমিদারীতে অবস্থিত বাজারের ব্যবসায়ীর কাছে রাখা বক্তব্য।. পুরনো বা সাবেকীভাবও তিনি তুলে ধরেছেন, যেমন নিখিল যখন বিমলাকে প্রথম ভাড়াবাড়ীতে এনে তুলল, ঠিক সেই মুহূর্তে (এর প্রকাশ খুব ধীর গতিতে দেখান হয়েছে) আশা, ভয় সব মিলিয়ে এক দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা। পুরানোঐতিহ্য ভেঙে বেরিয়ে আসা, মনুষ্যত্বই মানুষকে পরিচালিত করে, এইসব ধ্বংস করে পরিবর্তন করতে হবে।

অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং অভিনয়ের তুচ্ছতার বোধই হ'ল রায়ের কাহিনীর মূলগত স্ব-বিরোধী টান। অতীতে নিখিল অভিনয় করেছে, এখন সে ফিরে গিয়েছে অভিনয় হীনতায়।□

ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট মান্থলি ফিল্ম বুলেটিনের সৌজন্যে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

সাইট অ্যান্ড সাউন্ড পত্রিকায় এনড্রু রবিনসনের সমালোচনার অংশ বিশেষ বিষয় – সত্যজিৎ-এর ‘ঘরে বাইরে’

হিন্দু ধর্মীয়-সংস্কার বিষয়ে একটি গভীরতম অনুসন্ধানমূলক ছবি দেবী। আর তারপর, দীর্ঘ প্রতিক্ষিত উজ্জ্বল ঝকঝকে কঠোর আত্মসংযমে বাঁধা এক মহান শিল্পের দাবী মিটিয়েছেন সত্যজিৎ তাঁর ঘরে বাইরে ছবিটিতে। সত্যজিৎ-এর কোন ছবি তাঁর অন্য কোন ছবির সংগে তুলনা করবার কতগুলো অসুবিধে আছে। কারণ সত্যজিৎ কখনও পুনরাবৃত্তি করেন না। তা সত্ত্বেও সত্যজিৎ-এর এই নতুন ছবিটি তাঁর তোলা ষাট-এর দশকের ছবি চারুলতার কথা মনে পড়ায়। দুটো ছবিরই কাহিনীকার রবি ঠাকুর, দুটো ছবিরই পরিবেশ প্রাচীন জমিদারী প্রাসাদ, দুটো ছবিরই কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে এক গভীর ত্রিমুখী প্রণয়ে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীদের যাত্রা করতে হয়েছে এক সীমাহীন দুঃখের মধ্যে দিয়ে। আবার একই সংগে চারুলতা ও ঘরে বাইরের তফাৎ অবশ্যই গভীর অর্থবহ। তফাৎ অন্তর্বস্তুর দিক থেকেও, তফাৎ স্টাইলের দিক থেকেও। চারুলতা অবশ্যই একটি প্রেমের গল্প। অন্যদিকে ঘরে বাইরে একটি ট্রাজেডিঃ অনেক জটিল এক জগৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে এই ছবিতে। এই ছবির চরিত্রদের যে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে ব্যক্তির নানান লিমিটেসনস। অনেক অনেক বেশি গভীর দৃষ্টি, অনেক পাকা হাতের কাজ অনেক বেশি অন্ধকার, খুঁড়ে বার করা হয়েছে এই ছবিতে।......

জাতির.... যেহেতু, সত্যজিৎ রায় এই সময়টাকে ধরতে চান একটি আশা আর তাদের ভেঙে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে, সেই প্রেক্ষাপটটি সারা ছবি জুড়ে উপস্থিত থাকে এক অবচেতনের মতো।

এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা উচিত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। বিশেষ করে, তাঁর অস্বস্তিকর ও অনুভূতিহীন বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগেই কিছুটা ভীরু, নার্সিসিজমে আক্রান্ত, সুখী সন্দীপ চরিত্রটির জন্য রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। মনে রাখতে হবে, বাংলায় উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯১৫। যখন সারাদেশ জুড়ে উঠেছিল সন্ত্রাসবাদের ঢেউ। আর ইংরাজীতে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে, সে বছরে রবীন্দ্রনাথ অমৃতসর (জালিয়ানওয়ালাবাগ) হত্যাকান্ডের প্রতি-বাদে নাইটহুড পরিত্যাগ করেন।

অবশ্য পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদী সমা-লোচক জর্জ লুকাচ উপন্যাসটিকে এই বলে আক্রমণ করেন যে এটি একটি নিকৃষ্টমানের Petit buorgeois গল্প যা থেকে কিনা আসলে গান্ধীবাদের একটি সুস্পষ্ট অথচ বিকৃতরূপ ফুটে বেরোয়।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর মানবাত্মা সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব দুঃখবাদ ‘ঘরে বাইরে’ ছবিটিকে দিয়েছে এক বিষাদখিন্নতা। সত্যজিৎ রায় এই ছবি জুড়ে ব্যাপৃত থাকেন ভারতীয় ইতিহাস এর সন্ধানে। সে ট্রাজেডী আসলে কোন এক বাঙালী ঐতিহাসিকের মতে সমস্ত সামাজিক অসন্তোষগুলিকে এক সামন্তবাদ মহত্তম ট্রাজেডীর নিহিত কারণ অনু- এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবে পরিণত করার ব্যর্থতা।

এই বিষণ্ণ পরিবেশে ছড়িয়ে আছে কিছু আলোর দিশা। যখন নিখিল ভারী পায়ে সিঁড়ি বেয়ে তার শোবার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়াল, বাইরে শোনে গুলির আওয়াজ। শুরু হয় দাঙ্গা, সে দাঙ্গায় সে মরবে বীরের মতো। সে তখন তার ব্যর্থতার কথা ভাবে, আমরা তাকে দেখি অনেক দূরত্বে আয়নায় প্রতিফলিত ছবির মতো। মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল কুশনের মহান দ্যুতিমান আভার মধ্যে। জানলার চৌক ফ্রেমে বাঁধা বাইরের নীল রাতের আকাশের মধ্যে। সে যেন দাঁড়িয়ে থাকে ছায়ার মত। সব মিলিয়ে সারা গল্প জুড়ে থাকা অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণগুলি ছাপিয়েও আমরা স্পর্শ করি রবীন্দ্রনাথের ঐক্য এবং শান্তির ভাবনাকে। □

১৯২১ জন্ম ২ মে। পিতা – সুকুমার রায়, মাতা – সুপ্রভা দেবী।

১৯২৩ পিতা সুকুমার রায়ের মৃত্যু।

১৯২৬ মা সুপ্রভা দেবী পুত্র সত্যজিৎকে নিয়ে ভাই পি. কে. দাসের কাছে উঠলেন।

১৯২৭ ইউ. রায় এণ্ড সন্স দেউলিয়া ঘোষণা।

১৯৩১ বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি।

১৯৩৬ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি। 'বয়েজ ওন পেপার' আয়োজিত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ। সংগীত ও চলচ্চিত্রে অনুরাগের সূত্রপাত।

১৯৩৮ ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯৪০ অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। শান্তিনিকেতনে কলা বিদ্যালয়ে ভর্তি।

১৯৪১ কলা বিদ্যালয়ের তিন সহপাঠীর সঙ্গে কোণারক, অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, খাজুরাহো বায় ভ্রমণে যাত্রা। ভ্রমণ অসমাপ্ত করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯৪২ শান্তিনিকেতন শিক্ষা পরিত্যাগ।

১৯৪৩ ডি. জে কীমার-এ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে যোগদান।

১৯৪৪ চিত্রনাট্য লেখা অভ্যাস শুরু।

১৯৪৫ সিগনেট প্রেসে সংযুক্ত হন। পথের পাঁচালীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, আম-আঁটির ভেঁপু-র ছবি সহযোগে বর্ণনায় যুক্ত। এই উপন্যাসকে চলচ্চিত্রায়িত করার ভাবনার সূত্রপাত।

১৯৪৬ ঘরে-বাইরে-র প্রথম পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য লেখেন এটি চলচ্চিত্রায়িত করবার প্রয়াস সত্যজিতের আপোষহীন মনোভাবের জন্য শুরুতেই বিনষ্ট।

১৯৪৭ ক্যালকাটা-চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান এবং চলচ্চিত্র আন্দোলন-এর সাথে যোগাযোগ শুরু।

১৯৪৮ মাকে সঙ্গে নিয়ে আলাদাভাবে থাকা শুরু। কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৯ বিজয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ। স্টেটসম্যান পত্রিকায় চলচ্চিত্রের সমালোচনা প্রকাশ।

১৯৫০ প্রথম বিদেশ যাত্রা। কর্মস্থল থেকে আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে ইউরোপ যাত্রা। সাড়ে চার মাসের মধ্যে ৯৯টি চলচ্চিত্র দেখেন। ডি. জে. কীমার ত্যাগ এবং কিছুদিনের জন্য বেনসনে সংযুক্ত হন।

১৯৫১ বিভিন্ন উপায়ে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা। টাকার জন্য ইচ্ছানুরূপ কাজে বাধা।

১৯৫৫ প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালীর মুক্তিলাভ।

১৯৫৬ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্তির শুরু।

১৯৫৭ ভেনিস যাত্রা। পৃথিবী ভ্রমণ শুরু।

১৯৫৮ নিউইয়র্ক, ব্রাসেলস্ যাত্রা।

১৯৫৯ সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার অর্জন। পদ্মশ্রী লাভ।

১৯৬০ ভিয়েনায় জুরী নিযুক্ত। মাতা সুপ্রভা দেবীর মৃত্যু।

১৯৬১ শিশুদের মাসিকপত্র সন্দেশ নবপর্যায়ে শুরু করেন।

১৯৬২ বার্লিন-এ জুরী নিযুক্ত।

১৯৬৩ মস্কো-য় জুরী নিযুক্ত। বার্লিন যাত্রা।

১৯৬৪ বার্লিন ও মস্কো যাত্রা।

১৯৬৫ দিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরী নিযুক্ত। পদ্মভূষণ উপাধি লাভ। অ্যাকপুলকা, বার্লিন ও কেমব্রিজ যাত্রা।

১৯৬৬ বার্লিন, টোকিও যাত্রা।

১৯৬৭ নিউইয়র্ক, প্যারিস, লণ্ডন যাত্রা। ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ।

১৯৬৮ ম্যানিলা, মেলবোর্ণ যাত্রা।

১৯৬৯ বার্লিন, টিউনিসিয়া যাত্রা।

১৯৭০ বার্লিন যাত্রা।

১৯৭১ লণ্ডন যাত্রা।

১৯৭২ তেহরান এবং টরেন্টো-য় জুরী নিযুক্ত।

১৯৭৩ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টর অফ্ লেটারস্ উপাধি প্রদান। বার্লিন, চিকাগো, সুইডেন যাত্রা।

১৯৭৪ লণ্ডনের রয়েল কলেজ অফ্ আর্টস্ কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান। পুণার ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশান ইন্স্টিটিউট-এর দ্বাদশ সমাবর্তনে সমাবর্তনী ভাষণ। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় অন্তর্ভুক্তি।

১৯৭৪-৭৫ ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরী-চেয়ারম্যান নিযুক্ত।

১৯৭৫ ব্রিটিশ ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক 'গত অর্ধ শতকের অন্যতম বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক'-এর সম্মান প্রদর্শন। পুণা পৌরসভার সম্বর্ধনা লাভ।

১৯৭৬ পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভ। প্রথম ইংরাজী চলচ্চিত্র গ্রন্থ–'Our films, Their films'-এর প্রকাশ।

১৯৭৬-৭৭ ভারতের ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরী-চেয়ারম্যান নিযুক্ত।

১৯৭৮ ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট অফ্ লিটারেচার উপাধি প্রদান। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কর্তৃক সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশীকোত্তম' উপাধি প্রদান।

১৯৭৯ মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে গত অর্ধশতকে বিশ্বচলচ্চিত্রে মৌলিক অবদানের জন্য ন'জন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারের মধ্যে অন্যতম হিসাবে পুরস্কৃত।

১৯৮০ (ফেব্রু) বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি লিট. উপাধি প্রদান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি প্রদান।

সত্যজিৎ রায় □ চলচ্চিত্র-পঞ্জী

পথের পাঁচালী ১৯৫৫

প্রযোজনা	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মূল কাহিনী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
সংগীত	রবিশঙ্কর

অভিনয়ে : করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনীবালা, পিনাকী সেনগুপ্ত, উমা দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখ : ২৬-৮-১৯৫৫।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড।

অপরাজিত ১৯৫৬

প্রযোজনা	এপিক ফিল্মস্ কলকাতা
মূল কাহিনী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
সংগীত	রবিশঙ্কর

অভিনয়ে : করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীরণ ঘোষাল প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখ : ১১-১০-১৯৫৬।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড।

পরশপাথর ১৯৫৭

প্রযোজনা	প্রমোদকুমার লাহিড়ী
মূল কাহিনী	পরশুরাম (রাজশেখর বসু)
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
সংগীত	রবিশঙ্কর

অভিনয়ে : তুলসী চক্রবর্তী, রানীবালা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, কালী ব্যানার্জী, সন্তোষ দত্ত প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখ : ১৭-১-১৯৫৮।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড।

জলসাঘর ১৯৫৮

প্রযোজনা	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন
মূল কাহিনী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
সংগীত	ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খান

অভিনয়ে : ছবি বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী লাহিড়ী, পিনাকী সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখ : ১০-১০-১৯৫৮।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড।

অপুর সংসার ১৯৫৯

প্রযোজনা	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন
মূল কাহিনী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	সত্যজিৎ রায়

আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
সংগীত	রবিশংকর

অভিনয়েঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ১-৫-১৯৫৯।

পরিবেশকঃ ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

দেবী ১৯৬০

প্রযোজনা	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন
মূল কাহিনী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা ও চিত্রনাট্য	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
সংগীত	আলি আকবর খান

অভিনয়েঃ ছবি বিশ্বাস, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ১৯-২-১৯৬০।

পরিবেশকঃ জনতা পিকচার্স এন্ড থিয়েটার্স লিমিটেড।

তিনকন্যা ১৯৬১

প্রযোজনা	সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন
মূল কাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি ছোট গল্প
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ অনিল চট্টোপাধ্যায়, চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জী, কণিকা মজুমদার, কুমার রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অপর্ণা দাশগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ৫-৫-১৯৬১।

পরিবেশকঃ ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ১৯৬২ (রঙীন)

প্রযোজনা	এন. সি. এ. প্রোডাকশ
মূল কাহিনী	সত্যজিৎ রায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ ছবি বিশ্বাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুপ মুখার্জী, অলকানন্দা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, এন. বিশ্বনাথন প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ১১-৫-১৯৬২।

পরিবেশকঃ এন. সি. এ. প্রোডাকশন।

অভিযান ১৯৬২

প্রযোজনা	অভিযাত্রিক
মূল কাহিনী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ওয়াহিদা রেহমান, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ২৮-৯-১৯৬২।

পরিবেশকঃ ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড।

মহানগর ১৯৬৩

প্রযোজনা	আর. ডি. বনশল
মূল কাহিনী	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ২৭-৯-১৯৬৩।

পরিবেশকঃ আর. ডি. বি. এন্ড কোং।

চারুলতা ১৯৬৪

প্রযোজনা	আর. ডি. বনশল
মূল কাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ মাধবী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ২৭-৯-১৯৬৪।

পরিবেশকঃ আর. ডি. বি. এন্ড কোং।

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ ১৯৬৫

প্রযোজনা	আর. ডি. বনশল
মূল কাহিনী	প্রেমেন্দ্র মিত্র ও পরশুরাম
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ সতীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ৭-৫-১৯৬৫।

পরিবেশকঃ আর. ডি. বি. এন্ড কোং।

নায়ক ১৯৬৬

প্রযোজনা	আর. ডি. বনশল
মূল কাহিনী	সত্যজিৎ রায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, নির্মল ঘোষ, সুমিতা সান্যাল, সুব্রত সেন প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ৬-৫-১৯৬৬।

পরিবেশকঃ আর. ডি. বি. এন্ড কোং।

চিড়িয়াখানা ১৯৬৭

প্রযোজনা	স্টার প্রোডাকসন্স
মূল কাহিনী	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ উত্তমকুমার, কণিকা মজুমদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, গীতালী রায়, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ২৯-৯-১৯৬৭।

পরিবেশকঃ বলাকা পিকচার্স।

গুপীগাইন বাঘাবাইন ১৯৬৮ (আংশিক রঙীন)

প্রযোজনা	পূর্ণিমা পিকচার্স
মূল কাহিনী	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ হারীন চট্টোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, জহর রায়, চিন্ময় রায় প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ৮-৫-১৯৬৯।

পরিবেশকঃ শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

অরণ্যের দিনরাত্রি ১৯৬৯

প্রযোজনা	প্রিয়া ফিল্মস্
মূল কাহিনী	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, সিমি, পাহাড়ী সান্যাল, কাবেরী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ১৬-১-১৯৭০।

পরিবেশকঃ শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৭০

প্রযোজনা	প্রিয়া ফিল্মস্
মূল কাহিনী	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণা বসু, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চৌধুরী প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ২৯-১০-১৯৭০।

পরিবেশকঃ শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সীমাবদ্ধ ১৯৭১ (আংশিক রঙীন)

প্রযোজনা	চিত্রাঞ্জলী
মূল কাহিনী	শংকর
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ বরুণ চন্দ, শর্মিলা ঠাকুর, পারমি চৌধুরী, অজয় ব্যানার্জী, হারীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

মুক্তির তারিখঃ ২৪-৯-১৯৭১।

পরিবেশকঃ পিয়ালী পিকচার্স।

অশনি সংকেত ১৯৭৩ (রঙীন)

মূল কাহিনী	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ববিতা, সন্ধ্যা রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, ননী গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ১৫-৮-১৯৭৩।

পরিবেশকঃ বলাকা মুভিজ প্রাইভেট লিমিটেড।

সোনার কেল্লা ১৯৭৪ (রঙীন)

প্রযোজনা	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মূল কাহিনী	সত্যজিৎ রায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কামু মুখার্জী, কুশল চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ২৭-১২-১৯৭৪।

পরিবেশকঃ ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

জন-অরণ্য ১৯৭৫

মূল কাহিনী	শংকর
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, দীপংকর দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত, গৌতম চক্রবর্তী, আরতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ২০-২-১৯৭৬।

পরিবেশকঃ ইনদাস।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী (হিন্দী) ১৯৭৭ (রঙীন)

প্রযোজনা	সুরেশ জিন্দাল
মূল কাহিনী	প্রেমচন্দ
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ সঞ্জীবকুমার, সৈয়দ জাফরী, শাবানা আজমী, আমজাদ খান, রিচার্ড অ্যাটেনবরো, টম অলটার, ভিক্টর ব্যানার্জী প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ২৯-৯-১৯৭৮ (কলিকাতা)।

পরিবেশকঃ ডি. কে. বি. প্রাইভেট লিমিটেড।

জয় বাবা ফেলুনাথ ১৯৭৮ (রঙীন)

প্রযোজনা	আর. ডি. বনশল
মূল কাহিনী	সত্যজিৎ রায়
পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংগীত	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

অভিনয়েঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী, উৎপল দত্ত, জিৎ বোস প্রভৃতি।

মুক্তির তারিখঃ ৫-১-১৯৭৯।

পরিবেশকঃ আর. ডি. বি. এন্ড কোঃ।

হীরক রাজার দেশে ১৯৮০ (রঙীন)

প্রযোজক	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস

অভিনয়েঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত ও অন্যান্য।

ঘরে বাইরে ১৯৮৪ (রঙীন)

প্রযোজক ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভলপমেন্ট করপোরেশন

মূল কাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস

অভিনয়েঃ স্বাতিলেখা চট্টোপাধ্যায়, ভিক্টর ব্যানার্জি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মুক্তির তারিখঃ ৪-১-১৯৮৫।

পরিবেশকঃ ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

দূরদর্শন চিত্র (টি ভি.)

টু ১৯৬৪

দূরদর্শন চিত্র

পিকু ১৯৮২ (রঙীন)

প্রযোজক	ফরাসী টেলিভিশন
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস

অভিনয়েঃ অর্জুন গুহঠাকুরতা, অপর্ণা সেন, ভিক্টর ব্যানার্জি ও অন্যান্য

সদগতি (হিন্দি, রঙীন) ১৯৮২

প্রযোজক	দূরদর্শন
চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা	সত্যজিৎ রায়
মূলকাহিনী	প্রেমচন্দ
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত
শিল্প নির্দেশনা	অশোক বোস

অভিনয়েঃ ওমপুরি, শাবানা আজমি, মোহন আগাশে ও অন্যান্য

মুক্তিঃ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দিল্লী দূরদর্শন থেকে প্রথম প্রদর্শিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ (তথ্যচিত্র) ১৯৬১

প্রযোজক — ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন

চিত্রনাট্য, পরিচালনা এবং ধারাভাষ্য	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা	বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সংগীত	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

সিকিম (তথ্যচিত্র) ১৯৭১

ইনার আই (তথ্যচিত্র) ১৯৭৪ (রঙীন)

পরিচালনা, সংগীত, চিত্রনাট্য ও ধারাভাষ্য	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

বালা (তথ্যচিত্র) ১৯৭৬ (রঙীন)

পরিচালনা, সংগীত ও চিত্রনাট্য	সত্যজিৎ রায়
আলোকচিত্র	সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা	দুলাল দত্ত

চিত্রনাট্য রচনা (অন্যান্য চলচ্চিত্রে)

বাক্স বদল (পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত)

ইণ্ডিয়ান আয়রন এন্ড স্টীল (পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত)

ফটিক চাঁদ (পরিচালক সন্দীপ রায়)

সংগীত যোজনা (অন্যান্য চলচ্চিত্রে)

বাক্স বদল (পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত)

শেক্সপীয়রওয়ালা (পরিচালক জেমস্ আইভরী)

গ্লিমপ্সেস্ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল (পরিচালক বংশী চন্দ্রগুপ্ত)

দার্জিলিংঃ হিমালয়ান ফ্যানটাসী (প্রযোজনা গ্রাফিক ডকুমেন্টারিস)

গঙ্গাসাগর মেলা (পরিচালক বংশী চন্দ্রগুপ্ত)

কোয়েস্ট অফ ওয়েলথ (পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত)

হাউস দ্যাট নেভার ডাইস (পরিচালক টনি মেয়ার)

ধারাভাষ্য (অন্যান্য চলচ্চিত্রে)

টাইগেল বোর (পরিচালক বিজয় মুলে)

ম্যাক্স মুলার (পরিচালক লেচনার এণ্ড থিল)

সত্যজিৎ রায় অর্জিত চলচ্চিত্র-পুরস্কারের তালিকা

পথের পাঁচালী

১। রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক (১৯৫৫) ২। শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিলরূপে কানের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত (১৯৫৬) ৩। এডিনবার্গ চলচ্চিত্র উৎসবে ডিপ্লোমা অফ মেরিট (১৯৫৬) ৪। ভ্যাটিকান পুরস্কার (১৯৫৬) ৫। ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন ক্যারবাও (১৯৫৬) ৬। সান্‌ফ্রান্‌সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের কৃতিত্ব অর্জন (১৯৫৭) ৭। সেলজ্‌নিক গোল্ডেন লরেল (১৯৫৭) ৮। কানাডার ভ্যানকুভার উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি (১৯৫৮) ৯। কানাডার দ্বিতীয় স্ট্রাটফোর্ড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির বিচারে সমালোচকদের পুরস্কার (১৯৫৮) ১০। নিউ ইয়র্কের আস্ক্রো থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসেবে সাংস্কৃতি পুরস্কার (১৯৫৯) ১১। টোকিওতে শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসেবে কিনেমা জাম্পো পুরস্কার (১৯৬৬) ১২। ডেনমার্কে বছরের শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপীয় ছবি হিসেবে বদিল পুরস্কার (১৯৬৬)।

অপরাজিত

১। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ পুরস্কার গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক (১৯৫৭) ২। ভেনিসে সিনেমা নুভো পুরস্কার (১৯৫৭) ৩। ভেনিসে সমালোচকদের পুরস্কার (১৯৫৭) ৪। সান্‌ফ্রান্‌সিসকো উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার (১৯৫৮) ৫। একই উৎসবে আন্তর্জাতিক সমালোচকদের পুরস্কার (১৯৫৮) ৬। আমেরিকায় ১৯৫৮-৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসেবে গোল্ডেন লরেল (১৯৫৮) ৭। সেলজ্‌নিক গোল্ডেন লরেল (১৯৬০) ৮। ডেনমার্কে বছরের শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপীয় ছবি হিসেবে বদিল পুরস্কার (১৯৬৭)।

জলসাঘর

১। রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক (১৯৫৮) ২। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ সংগীতের জন্য পুরস্কার (১৯৫৯)।

অপুর সংসার

১। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৫৯)। ২। লণ্ডন উৎসবে সাদারল্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ট্রফি (১৯৬০) ৩। এডিনবরা উৎসবে ডিপ্লোমা অফ মেরিট (১৯৬০) ৪। আমেরিকার ন্যাশনাল বোর্ড অফ রিভিউ অফ মোশন পিকচার্স প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবির পুরস্কার (১৯৬০)।

তিনকন্যা

১। মেলবোর্ন উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে গোল্ডেন বুমেরাং পুরস্কার (১৯৬২) ২। সেলজ্নিক গোল্ডেন লরেল (১৯৬৩)।

রবীন্দ্রনাথ (তথ্যচিত্র)

১। প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক (১৯৬১) ২। লোকার্নো উৎসবে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে গোল্ডেন শেইল (১৯৬১)।

অভিযান

১। রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক (১৯৬২)।

মহানগর

১। রাষ্ট্রীয় মানপত্র (১৯৬৩) ২। বার্লিন উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে রৌপ্য ভল্লুক (১৯৬৪)।

চারুলতা

১। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৬৪) ২। বার্লিন উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে রৌপ্য ভল্লুক (১৯৬৫)। ৩। বার্লিন উৎসবে ক্যাথলিক পুরস্কার (১৯৬৫) ৪। অ্যাকপুলকা উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি (১৯৬৫)।

নায়ক

১। বার্লিন উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কার (১৯৬৬) ২। ইউনিক্রিট (সিনেমা সমালোচকদের অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত পুরস্কার), বার্লিন (১৯৬৬)।

চিড়িয়াখানা

১। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার (১৯৬৮)।

গুপীগাইন বাঘাবাইন

১। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৬৯) ২। আডেলেড চলচ্চিত্র উৎসবে অসাধারণ গুণসম্পন্ন ফিচার ছবির জন্য সিলভার সাদার্ণ ক্রুস পুরস্কার (১৯৬৯) ৩। অকল্যাণ্ড চলচ্চিত্র উৎসবে মৌলিকতার জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার (১৯৬৯) ৪। টোকিওতে মেরিট অ্যাওয়ার্ড (১৯৭০) ৫। মেলবোর্ন উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি (১৯৭০)।

প্রতিদ্বন্দ্বী

১। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার (১৯৭১) ২। শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় চিত্র–জাতীয় পুরস্কার (১৯৭১)।

সীমাবদ্ধ

১। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৭২) ২। ভেনিস উৎসবে FIPRESCI (চলচ্চিত্র সমালোচকদের) পুরস্কার (১৯৭২)।

ইনার আই

১। প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক (১৯৭৩)।

অশনি সংকেত

১। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক (১৯৭৩) ২। বার্লিন উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণ ভল্লুক (১৯৭৩) ৩। চিকাগোর গোল্ডেন হুগো পুরস্কার (১৯৭৩)।

সোনার কেল্লা

১। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য ২। জাতীয় পুরস্কার শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা ৩। গোল্ডেন স্ট্যাচু পুরস্কার বছরের শ্রেষ্ঠ জীবন্ত ফিচার ছবি – শিশু এবং যুবকদের জন্য ১০ম তেহরান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৭৫)।

জন-অরণ্য

১। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার (১৯৭৬) ২। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার – শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য ৩। কার্লোভি ভারি পুরস্কার (১৯৭৬)।

শতরঞ্জ কি খিলাড়ী

১। বছরের শ্রেষ্ঠ হিন্দী ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার (১৯৭৭)।

জয় বাবা ফেলুনাথ

১। বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার (১৯৭৮)।

১৯৭৮ঃ বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কমিটি কর্তৃক সর্বকালের সেরা তিনজন চলচ্চিত্রকারের মধ্যে একজন হিসেবে মনোনয়ন। এছাড়া অপর দু'জন হলেন চার্লস চ্যাপলিন এবং ইঙ্গমার বার্গম্যান।

১৯৭৮ঃ অকসফোর্ড ইউনিভারসিটির ডক্টরেট।

১৯৮২ঃ চলচ্চিত্র শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য কান ও ভেনিস ফেস্টিভ্যাল কমিটি কর্তৃক বিশেষ সম্মান প্রদর্শন।

ছবিঃ নিমাই ঘোষ

একই সঙ্গে ত আর সব কাজ করা যায় না —সত্যজিৎ রায়

সাক্ষাৎকার
সত্যজিৎ দাশগুপ্ত

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলাম বেশ কিছুকাল আগে। সে সময় আমি একটি প্রবন্ধ রচনার কাজে সবেমাত্র হাত দিয়েছি। বিষয় ছিল, বাংলা ছায়াছবির তিন অগ্রণী পরিচালক (সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেন) তাঁদের ছবিতে বাঙালী মধ্যবিত্ত মানসের নানান দিক কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যজিৎবাবু তখন কলকাতায় ছিলেন না। উনি ব্যস্ত মানুষ, তাই একটি চিঠিতে বিস্তারিতভাবে আমার প্রয়োজনের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে ওঁর কাছে সময় চেয়েছিলাম। তার অল্পদিন বাদে ফিরে এসেছিলেন। ফোনে সময় ঠিক করে দিন সাতেক বাদে একদিন সকাল সোয়া আটটা নাগাদ ওঁর বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখি উনি কাজ করছেন। সামনে একটি কাঠের স্ট্যান্ড মত এবং কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে সেই স্ট্যান্ডের মাথায় লাগানো বোর্ডের ওপর টুকরো টুকরো কাগজ সেঁটে দিচ্ছেন। চতুর্পাশে বই। বিশাল জানলাটা দিয়ে রোদ আসছিল অনেকখানি। আমার সঙ্গী জয় দাশগুপ্ত সেখানে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা ঘোরাবার তোড়জোড় করতেই উনি বল্লেন, তা প্রবন্ধে ছবি কি হবে? আর বল্লেন, আমি কিন্তু কাজ করতে করতেই কথা বলে যাব। মাঝেমধ্যে তীব্র চোখে হাতের কাজ থামিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকছিলেন। মাঝখানে কিছুক্ষণ আলোচনা বন্ধ ছিল। দু'জন মহিলা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কোন একটা বক্তৃতার প্রস্তাব নিয়ে।

প্রশ্নঃ আপনার চিন্তা-ভাবনাকে অনেক কিছুই প্রভাবিত করে থাকবে এই সুদীর্ঘ সময়ে। এই 'ইন্টালেক্‌চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সের' ব্যাপারটি থেকেই শুরু করা যাক। মারী সীটনকে আপনি বলেছিলেন যে এমনকি কলেজে উঠেও আপনি চারপাশের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তেমনভাবে সজাগ হয়ে ওঠেননি এবং শান্তিনিকেতনে যাবার পরই মস্তবড় একটা পরিবর্তন এসেছিল। আমার মনে হয় আপনার শিল্পচিন্তার মধ্যে হিউম্যানিজম কিংবা ওই যেটাকে বলা যায় এনলাইটেন্ড লিবারেলিজম্ এসবের যে ধারাটা চলে আসছে তারও সূত্রপাত ওই সময়টাতেই হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্য অনেক কিছুই হয়ত যোগবিয়োগ হয়ে থাকবে, ত এইখান থেকেই শুরু করছি।

উঃ এখানে ব্যাপার হচ্ছে একটা কথা আপনাকে বলব? আমরা নিজেদের ইনফ্লুয়েন্সটা কিন্তু সেভাবে এ্যানালাইজ করিনা। ওটা বার করা হচ্ছে সমালোচকদের কাজ। কোত্থেকে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্সড্ হয়েছি সেটা ওভাবে বিশ্লেষণ কোন শিল্পী করে বলে আমার মনে হয়না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ে। পড়াশুনা বাড়ে। নানারকম সবকিছু বেড়ে যায়। জ্ঞানের

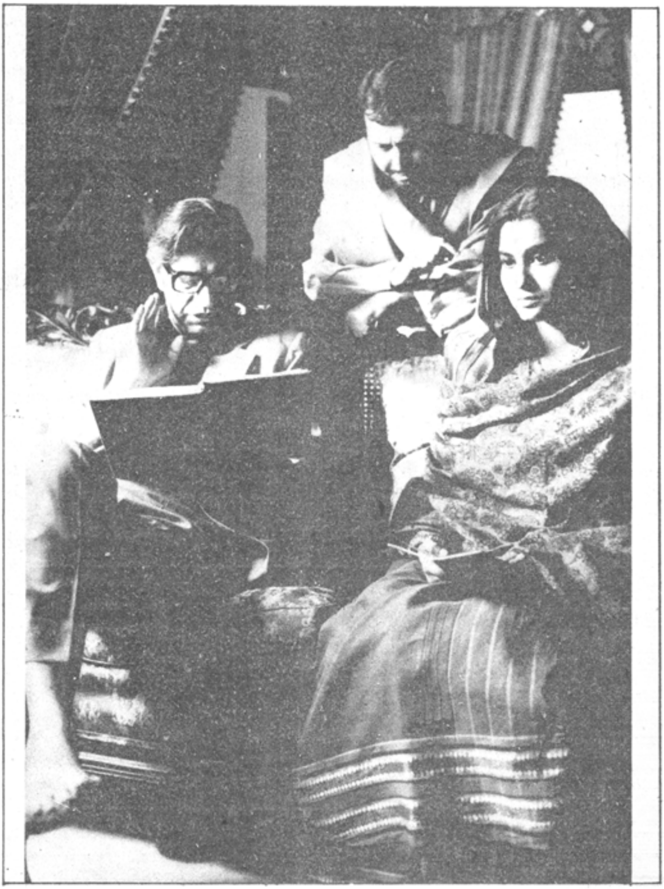

সত্যজিৎ রায় নির্দেশ দিচ্ছেন স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ছবিঃ নিমাই ঘোষ

গোটা পরিধিটাই অনেকখানি বেড়ে যায়। সেখান থেকে মানুষের অভিজ্ঞতা অনেকটা সমৃদ্ধ হয় স্বাভাবিকভাবে এবং সেইসব অভিজ্ঞতার ছাপ শিল্পীর কাজের মধ্যে পড়তে থাকে। কিন্তু সে বিষয়ে যদি নির্দিষ্ট করে বলতে বলা হয় যে ঠিক কে কে বা কি কি জিনিস ইন্‌ফ্লুয়েন্স করল সেটা বলা খুবই মুস্কিল।

প্রঃ আচ্ছা এই যে আপনি মনে করেন যে শান্তিনিকেতনে থাকাটা আপনার জীবনে একটা বিশাল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল সেই গোটা প্রক্রিয়াটার ভেতর রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব, দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রভাব কতখানি?

উঃ না, সেই দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমি সেরকম ভাবে বলিনি। আমার প্রভাব যেটা এসেছিল সে ব্যাপারে ফাইন আর্টসের ডিপার্টমেণ্টে আমার মাস্টারমশাইদের ভূমিকাটাই প্রধান ছিল। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি কোন একটা সম্পর্ক ছিল বলে আমার মনে হয়না। নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এঁদের নাম সকলের আগে করতে হয় তাহলে। এটা যে সব সময় শুধু শিক্ষকদের কাছ থেকেই এসেছে তাও নয়। আমার বন্ধুবান্ধব যাঁরা তখন ওখানে ছিলেন কিংবা শান্তিনিকেতনের বাইরে তাঁদের প্রভাব রয়েছে আমার ওপর। তারপর নিজের পড়াশুনা ত ছিলই। ওখানে খুব ভাল একটা লাইব্রেরী ছিল আমাদের এবং ফিল্মের ওপর সিরিয়াস্ বইগুলো আমি ওখানেই প্রথম পড়ি। যেমন পল্ রথা কিংবা স্পটেস্‌উডের বইগুলো। তারপর সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমার যে ধারণা সেটাও ওই শান্তিনিকেতনেই এসেছিল কেননা সেই ট্রাডি-শনটার সঙ্গে সেরকম পরিচয় শান্তিনিকেতন যাবার আগে আমার ছিলনা।

প্রঃ এই ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাপারে আমার মনে হয় যে রেনেসাঁসের সঙ্গে সম্পর্কিত যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা বোধ হয় প্রথম থেকেই আপনার মধ্যে ছিল ডমিনেণ্ট ট্রেইট হিসাবে?

উঃ হ্যাঁ সেটা ছিল। পূর্ব এবং পশ্চিমের ভেতরে একটা সিন্‌থিসিসের ব্যাপার...

প্রঃ এই সিন্‌থিসিসের ব্যাপারটাকে আমি যদি এভাবে ব্যাখ্যা করি যে মূলতঃ আপনি একজন হিউম্যানিস্ট হিসাবেই বরাবর শিল্পের ভেতর এক্সপ্লোর করেছেন...একটা সীমানা টেনে না দেওয়ার যে...

উঃ এখন সিন্‌থিসিসের সঙ্গে সেটার সম্পর্ক আছে কিনা জানিনা। সেটা হয়ত আমার নিজের অবজারভেসনের একটা ক্ষমতা, মানুষ চেনার ক্ষমতা বা প্রবণতা। সেটা হয়ত কিছুটা রক্তের মধ্যেও থাকে। আমার ফ্যামিলিতেও হয়ত সে জিনিসটা ছিল খানিকটা। এও হতে পারে। এটা ত আর শুধু পড়াশুনা করেই শেখা যেতে পারে এমন ত নয়। তবে ফিল্ম যখন করতে যাচ্ছি, ফিল্মের আগে ত আমার টেন্‌ডেন্‌সিস্ কোনদিকে বা কি তার কোন পরিচয় কোনকিছুতে পাওয়া যায়নি কেননা শিল্পী হিসেবে আমার প্রথম কাজ সিনেমা পরিচালক হিসেবেই তার আগে যেগুলো করেছি, সে কমার্শিয়াল আর্টসই হোক আর গ্র্যাফিক আর্টসই বলুন, তার মধ্যে যে জিনিসটা ফুটে উঠেছিল সেটা হচ্ছে দেশী আর বিলাতীর একটা সংমিশ্রণ, সেটা নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছিল। তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যাবে আমার তখনকার গ্র্যাফিক কাজে বা আমার বইএর মলাট, আমার বিজ্ঞাপন, আমার ক্যালিগ্রাফি এসবের মধ্যে। যেখানে দেশী আর বিলাতী দুটো দুদিকের ট্রাডিশন সম্বন্ধে একটা এ্যাওয়্যারনেস্ সেটা পাওয়া যাবে। কিন্তু তারপর সত্যিকারে মানুষের প্রতি আমার এ্যাটিটিউড, সেটাকে লিবা-রেলিজম্ হিউম্যানিজম যাই বলা যাক না কেন, সেটার ছাপও গ্র্যাফিক আর্টসে খুব একটা পড়েনা...সেটা আস্তে আস্তে সিনেমার ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছিল হয়ত।

প্রঃ হ্যাঁ এবার তাহলে ছবির কথাতেই আসা যাক। বাংলা সাহিত্যের ক্ল্যাসিক্স নিয়ে বেশ কয়েকখানা ছবি করেছেন আপনি, সেখানে আবার রবীন্দ্র সাহিত্যের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব ছবিতে একটা 'ক্লাসিসিজম্' মানে যেসব মানুষ, যেসব জীবন আপনি তুলে ধরেছেন সেখানে একটা স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সমালোচকের মতে এই ক্ল্যাসিসিজম্‌ই আপনার ট্রিটমেণ্টকে নান্দনিকভাবে সূক্ষ্ম একটা জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে মানুষের চরিত্রের কতগুলো কদর্য দিক খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা পরেনা। এরকম একটা অভিযোগ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

উঃ চরিত্রের এইরকম সব কদর্য দিক আমার ছবিতে যথেষ্ট আছে। এখন কদর্যতা এখানে কিসের? চোখের সামনে যেটা একেবারে সোজাসুজি প্রকট হয়ে পড়ছে নাকি ব্যবহারের একটা কদর্য রূপ যেটা আভাসে ইঙ্গিতে ছবির মধ্যে আসছে? চোখের সামনে জীবনের যে নোংরা ছবিটা যেটাতে এক ধরনের ক্লীপাতা বা এক ধরণের...যেমন বস্তির জীবন ধরা যেতে পারে, সেটা হয়ত সেরকম ভাবে আমার ছবিতে নেই। কিন্তু, যেমন আমার মনে হয় প্রথম ছবিতেই সর্বজয়া এবং ইন্দিরের সম্পর্কের মধ্যে যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটাকে এককথায় যথেষ্ট রূঢ় বলা যেতে পারে, খুবই রূঢ়, যেরকম রূঢ় বাস্তব হয়ত আমাদের বাংলা ছবিতে খুব বেশি দেখানো হয়নি। কাজেই ওই অভিযোগটা আমার কাছে তেমন একটা জোরালো মনে হয়না আদৌ। তারপর এখন যদি চোখের সামনেও কিছু দেখানোর প্রয়োজন হয় সেওত 'সদ্‌গতি'তে দেখানো হয়েছে, তবে আমার ত নানা রকম বিষয় সম্বন্ধে একটা উৎসাহ ছিল, কৌতূহল ছিল কাজেই অনেক সময় আমি এমনও করেছি যেটাকে বাইরের চোখ দিয়ে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে সবসময় খুব সুন্দর মনে হয়। যেমন চারুলতা, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এমনিতে চোখের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেখানে কোনরকম মলিনতা নেই কিন্তু মনের দিক দিয়ে যথেষ্ট আছে। আমি ত সব সময় দুটোকে দুরকম ভাবে ধরি, ওই চোখ আর মনের মধ্যে দুটো আলাদা জিনিসকে আমি ধরতে চেয়েছি বরাবর। মানুষের মনের মধ্যে অনেক মলিনতা থাকতে পারে যেটা কোনদিনই আমার ছবি থেকে বাদ পড়েনি! মনস্তত্বের দিকটায় আমি জোর দিয়েছি বলতে পারেন।

প্রঃ আমিও সেটাই বল-ছিলাম। সমালোচকদের বক্তব্য হল যে জীবনকে একেবারে নগ্নরূপে দেখবার ব্যাপারটা নিয়ে কোথায় যেন আপনার একটা অস্বস্তি এসে যায় মানে আপনার যে সৌন্দর্যবোধ, যে একটা কাব্যিক সূক্ষ্মতা সেসবের সাথে কোথায় যেন ঠিক খাপ খায়না। সত্তরের দশকে এখানকার মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট নিয়ে যে ছবিগুলো করেছিলেন সেগুলোকে মূল্যায়ণ করতে গেলেও এই কথাটা মাথায় রাখলে ভাল হয় বলে আমি মনে করি।

উঃ তা সেসবের সঙ্গে কাব্যিক সূক্ষ্মতা বা নান্দনিক ব্যাপারগুলোর কি সম্পর্ক আপনি ইম্প্লাই করতে চাইছেন? মানে আপনি কি বলতে চাইছেন যে আমি ওই আপনার কথায় যা কিছু কাব্যিক নয় কিংবা প্রচলিত অর্থে নান্দনিক ভাবে সুন্দর নয়

'ঘরে বাইরে' ছবিতে মনোজ মিত্র ও ভিক্টর ব্যানার্জী

ছবি: নিমাই ঘোষ

অর্থাৎ কিনা জীবনের তথাকথিত একেকবারে রূঢ় বা কদর্য দিকগুলো এড়িয়ে যেতে চেয়েছি? খুব গোড়ার দিকের ছবিতেও, যেমন 'দেবী' ছবিটাতে যথেষ্ট 'স্ট্রং' বিষয়বস্তু ছিল এবং তার ট্রিটমেন্টের মধ্যেও কোনরকম ছাড়ান ছিলনা। কোনদিক দিয়ে কোন আপোস করতে চাইনি সেখানে। কিন্তু তারপরে মোটামুটি যে ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেছি তাতে হয়ত ওই যেটাকে আপনি বলছেন রূঢ় বাস্তব সেটা ছিলনা। সে প্রশ্নও সেখানে ওঠেনি। কিন্তু পরে সত্তরের দশকে আমার নিজেরই মনে হয়েছিল যে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের কতগুলো সমস্যার দিক তুলে ধরা যায় এবং তার একটা কারণ হচ্ছে ওই সময় কতগুলো বিশেষ বিশেষ গল্প আমার চোখে পড়েছিল।

প্রঃ প্রতিদ্বন্দ্বী, জনঅরণ্য এইসব ছবির কথা বলছেন যু.

উঃ হ্যাঁ সেই ছবিগুলোর কথাই ধরা যাক। যে সময়টায় আমার মনে হয়েছিল এবং বিশেষ করে শহরের প্রকৃতটাও এমন ছিল, যেমন নানারকম সমস্যার মধ্যে শহরের চেহারাটাও এমন হয়েছিল যাতে মধ্যবিত্তের সমস্যাগুলো একটু বেশি করে যেন বাইরে বেরিয়ে আসছিল। সব ব্যাপারগুলোই একটু বেশি প্রকট হয়ে উঠছিল। ফলে আমার মনে হয় তখন, যে সেগুলো নিয়ে ছবি করা যেতে পারে। তখন আপনা থেকেই সে তাগিদটা অনুভব করেছিলাম আমি।

প্রঃ মোটামুটিভাবে বলা যায় যে উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনই আপনার সেসব ছবির বিষয়বস্তু হয়েছে। যেমন 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'জনঅরণ্য'

উঃ প্রতিদ্বন্দ্বীটাকে ঠিক উচ্চমধ্যবিত্ত বলা যায়না। বরং 'সীমাবদ্ধ'কে আপার মিডল্ ক্লাসের ছবি বলতে পারেন। আচ্ছা এই আপার মিডল্ক্লাস বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন বলুন তো?

প্রঃ মানে আমি বলতে চাইছিলাম যে মধ্যবিত্ত সমাজের নীচের দিকে যে জীবন সেই নিম্নমধ্যবিত্ত আপনার ছবিতে সেভাবে আসেনি।

উঃ ও বুঝতে পারছি। সেটা আমি এখনও সে ধরনের বিষয়বস্তু আছে এমন গল্প পাইনি তাই করিনি। এ ব্যাপারে আমার যে কোন বিশেষ বাধা বা আপত্তি আছে তা ত নয়। গল্প পেলেই করব। মানে কথা হল যে একই সঙ্গে ত আর সবকাজ করা যায়না। ওটা আস্তে আস্তে হতে থাকে।

প্রঃ আচ্ছা আমি একটু অন্যদিকে সরে যাচ্ছি। জনঅরণ্যে আপনি যেভাবে শেষ করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। যা ঘটছে চারপাশে তাকে মেনে নেওয়া কিংবা তার সঙ্গে একটা আপোস করা এ ব্যাপারটি মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকের চরিত্রের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ত' সেই কম্প্রোমাইজের ঘটনাকেই সেখানে আপনি তুলে ধরেছিলেন। অনেকে আবার প্রতিবাদের দিকটাকেও বড় করে দেখিয়েছেন। আমার মনে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম্প্রোমাইজ করাটাই আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের যুবককে ভাল করে চিনিয়ে দেয়।

উঃ কম্প্রোমাইজ মানে আমি ত কোনদিন কোথাও কোন সমাধান বাতলে দিইনি। আমার যেটা মনে হয়েছিল যে সমস্যাটাকে তুলে ধরাটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার। সলিউশনের দিকে ত আমি কোনদিনই যাইনি কারণ সলিউশনত আমাদের জানাও নেই অনেক ক্ষেত্রে। কাজেই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমস্যাটাকে পরিষ্কার-ভাবে ফুটিয়ে তুলে তার থেকে দর্শকদের সচেতন করা এবং আমি মনে করি এইটাই একজন শিল্পীর সঠিক কাজ হওয়া উচিৎ। আগবাড়িয়ে কোনরকম কিছু সাজেস্ট আমি কোনদিন করিওনি, করতে পারবোও না,

আর সেটা করার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করিনা।

প্রঃ আপনি একজন সচেতন শিল্পী। চারদিকের ঘটনাসব একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে দেখে যাচ্ছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের কোন কোন দিকগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে ছবি হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?

উঃ মধ্যবিত্ত জীবন...আমি ওরকম কিন্তু সমস্যা দিয়ে আরম্ভ করিনা। কি কি সমস্যা আছে, অতএব সেই সব সমস্যা দিয়ে ছবি তুলতে হবে বা সেইসব সমস্যার সমাধান করতে হবে এভাবে কিন্তু আমি দেখছি না ব্যাপারগুলোকে। একটা ত সমস্যা রয়েছেই, যেটা বেকারত্বের সমস্যা, সেটা কোনদিন শেষও হবেনা এবং এনিয়ে চিরকালই ছবি তোলা যাবে। এর বাইরেও যা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সে ত সবই রয়েছে। একেবারে ঘটমান কালের কথা যদি ধরি, ইনফ্লেশন্ বলা যেতে পারে, পপুলেশন্ বলা যেতে পারে। আবার একবারে কলকাতার কতগুলো নির্দিষ্ট সমস্যা রয়েছে। কিন্তু ওই যা বললাম, সমস্যার কথাটা আগে ভেবে এই সমস্যা নিয়ে এবারে তাহলে ছবি তোলা যাক-সেরকম কিন্তু মনোবৃত্তি আমার নয়। গল্পের মধ্যে এবং সেটা শুধু যে সমস্যা নিয়েই গল্প হবে তা না। তার ভেতর বাইরের অনেক কিছু জিনিস এসে যাবে। সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা ম্যাক্রো-কসমিক্ ভাবে দেখানো হবে।

প্রঃ আচ্ছা আপনি নক্সাল-বাড়ি আন্দোলন নিয়ে কোন ছবি করেন নি কেন? সম্প্রতি কালে বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবকদের একটা অংশত এই আন্দোলনের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিল এবং হয়ত খানিকটা এখনও হচ্ছে। নতুন এবং পুরোনো বাঙালী পরিচালকদের অনেক ছবিতে এই আন্দোলনের ব্যাপারটা এসেছে বারবার টুকরো টুকরো ভাবে।

উঃ আমার ত মনে হয়না ওই ধরনের কোন সরাসরি রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আদৌ কোন ছবি করা যায় খোলাখুলিভাবে এদেশে। সেনসরশিপ আমাকে দেবেই না সেটা করতে।

প্রঃ এটাই সবথেকে বড় বাধা?

উঃ একেবারে বৃহত্তম অসুবিধা সেটা। আর তা না হলে খানিকটা করে, অন্যরা যেরকম করেন, খানিকটা করে এগিয়ে যান আবার পিছিয়ে যান, ওভাবে করেত কিছু হয়না। সম্ভবই না এটা করা। কেউ করেও না, করতে পারেও নি এবং করতে পারবেওনা কোনদিন।

প্রঃ আচ্ছা আজকাল কি একটুখানি লিবারেল মনে হচ্ছে এই সেন্সরশিপের হাবভাব? একটু বেশি সহ্য করা হচ্ছে এরকম বলা যায় কি?

উঃ কই, কিসের থেকে সেরকম কন্ক্লুশন টানবো আমি?

প্রঃ আমি অনেকদিন আগে আপনার লেখায় পড়েছিলাম যে আপনাকে বোধহয় বলা হয়েছিল যে সাদাটুপী মানে গান্ধীটুপীকে করপ্শনের প্রতীক করে দেখানো যাবেনা এবং সেটাকে কালো করে দিতে হবে।

উঃ হ্যাঁ, সেটা ত হয়ই। মানে সেন্সর বললেত একটা মনোলিথিক্ কিছু বোঝায় না। সেটাত বছরে বছরে বদলায় বা বেশ কিছুদিন পরপরই পাল্টে যায়। সেগুলো কতগুলো মানুষের সমষ্টিত এবং তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোকের বেশ বুদ্ধি থাকে আবার কিছু কিছু লোকের থাকেনা। সবই নির্ভর করে কারা বোর্ডে আছেন তার উপর। ব্যক্তিই এখানে আসল কথা। কাগজে লেখা নিয়মকানুনের ওপর এটা দাঁড়ায় না। ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনার ওপরই কাজগুলো হয় বা হয়না। এক এক সময় এমন হয় যে সেন্সরবোর্ডে কিছু বুদ্ধিমান লোক রয়েছে যাদের বলে বোঝান যায়। এর উল্টোটাও হয় কখনও কখনও। এমন নয় যে কোন পলিসি খুব শক্তভাবে ওপর থেকে তেমন ভেবেচিন্তে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রঃ সমকালীন চলচ্চিত্রের সমস্যা দিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আপনি কি মনে করেন যে আপনি একটি বৃহৎ দর্শক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন? এই প্রশ্নটা জরুরী এই জন্য যে এর থেকেই আমরা একটা বিষয় নিয়ে ভাবনা শুরু করতে পারি যে সস্তা এবং বিকৃত রুচির সিনেমাকে রুখতে হলে কি করা প্রয়োজন।

উঃ আমি ত সারা বাংলাদেশের অডিয়েন্সের কথা বলতে পারবনা। আমি যেটুকু জানি যে কলকাতায় একটা অডিয়েন্স তৈরি হয়েছে গত বিশ-পঁচিশ বছরে এবং নিঃসন্দেহে সেটা বেড়েও গিয়েছে যেটাকে আমার ছবির দর্শক বলা যেতে পারে। আমি যে কোন ছবিই করিনা কেন তারা দেখতে যাবে, এটা আমি জানি। কাজেই কলকাতার একটা দর্শক-গোষ্ঠীর ওপর আমি মোটামুটিভাবে নির্ভর করে ছবি করতে পারি, এটুকু বলা যেতে পারে। এখন তারপর শহরের বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা-আমার পক্ষে জানা একেবারেই সম্ভব নয়।

প্রঃ আচ্ছা এই যে দর্শক যেটা বেড়েছে বলছেন সেটাকে কি আপনি মোটামুটিভাবে বোদ্ধা মানে ছবি ভালোবাসেন, বুঝতে চান...

উঃ সেই শ্রেণীর দর্শক সংখ্যা বেড়েছে। সেটা বেড়েছে অবশ্যই। তবে তার পাশাপাশি বুদ্ধিহীন দর্শক যে একেবারে কমে গেছে তা নয় কারণ কাগজে চিঠিপত্র থেকে অনেক সময় বুঝতে পারি যে এখনও সেরকম দর্শক বহু আছে। কিন্তু আমার মনে হয় কিছুটা ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের জন্য এবং কিছুটা এ ধরনের ভালোভালো ছবি-ফেস্টিভ্যালের ছবি-দেখানোর জন্য কিছু সংখ্যক দর্শক আছে যারা ভালো ছবি, সিরিয়াস্ ছবি দেখতে প্রস্তুত।

প্রঃ আমারও পরের প্রশ্ন সেই বিষয়ে,-এই ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট আমাদের এখানে যথেষ্ট এফেক্টিভলি এগিয়ে যাচ্ছে কি?

উঃ আমারত বছরে একটা করে ছবি, কাজেই আমার ছবি দিয়ে বিচার করতে গেলে বছরে একবার করে মাত্র সুযোগ পাই এই মুভমেন্টের ট্রেন্ডটা বোঝবার।

প্রঃ না মানে সমষ্টিগতভাবে যদি বিচার করেন, অন্যান্য যেসব প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে.....

উঃ বহু নতুন ছবি তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে যেগুলো বাজারে এখনও দেখানোই হয়নি। তাছাড়া সব জিনিসটা ত পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। যেমন ডিসট্রিবিউশনের ব্যাপারটা, দেখানোর ব্যাপারটা। এসবই ছবি তৈরির সঙ্গে ভীষণভাবে ইন্টারলিংকড। আমার মনে হয় যারা এইসব সিরিয়াস ছবি তৈরি করছে তাদের ছবি দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা খুব দরকার। যদ্দিন না সেটা হচ্ছে এবং বেশ ব্যাপকভাবে হচ্ছে তদ্দিন সেটা বিচার করবারও সুযোগ কোনরকম পাওয়া যাবেনা। দর্শকশ্রেণী কি রকম তৈরি হল সেটা বোঝবারও কোন উপায় নেই।

প্রঃ এই প্রসঙ্গেই তাহলে জানতে চাইবো যে তরুণ যেসব পরিচালক নতুন নতুন ছবি তৈরি করছেন এবং যেটাকে বলা চলে এক ধরনের রাজনীতি সচেতন এবং রাজনীতি নির্ভর সিনেমা, এঁদের কেউ কেউ আবার কমিটেড সিনেমার কথাও বলে থাকেন, সে বিষয়ে আপনি কিভাবে ভাবছেন। আপনার কি মনে হয় যে এঁদের এইযে কালচারাল কনফ্রনটেশনের ব্যাপার এটাও এক ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি করছে

যেখানে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত শহুরে মধ্য এবং উচ্চবিত্ত, দর্শকের মধ্যেই গোটা ব্যাপারটা ঘোরাফেরা করছে ?

উঃ আমার তরুণ পরিচালকদের মধ্যে একজন এখানে উপস্থিত আছে কিন্তু (তার সামান্য আগে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এসেছেন এবং তাঁকে দেখিয়েই সত্যজিৎবাবু কথাটা বলে একটু হাসলেন) কাজেই আমার পক্ষে বলা খুবই মুস্কিল এখন। তবে এটা অত্যন্ত আশাজনক এবং আমরা সকলেই এইসব প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে আমি ওই কথাটাই বারবার করে বলতে চাই যে তাদের ছবি যথেষ্ট ব্যাপকভাবে দেখানোর সুযোগটা যতদিন না হচ্ছে ততদিন এই ইম্প্যাক্ট বিচার করবার কোন উপায় নেই। এই কাজটা করতেই হবে এবং সেটাও তারা করতে পারবেনা, সেটা সরকারের তরফ থেকে করতে হবে নতুন সিনেমা হাউস করে বা ডিসট্রিবিউটরদের মধ্যে এমন কয়েকজনের প্রয়োজন আছে যাঁদের সাহস এবং উৎসাহ থাকবে এ ধরনের ছবি দেখাবার। তারপর ছবি চলবে কি চলবেনা সেটাত ছবির ওপর নির্ভর করে, সেটা একমাত্র ছবির ওপরেই নির্ভর করে।

প্রঃ—মানে আপনি এখন মনে করছেন যে এটা এক ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি করছে ?

উঃ না, সেটা বিচার করবার এখনও সময় আসেনি।

প্রঃ সদ্‌গতি সম্পর্কে ভারত সরকারের এক মাননীয় মন্ত্রীর মন্তব্যে আপনি অত্যন্ত বিরক্তি এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এ নিয়ে নানা মহলে অনেক চর্চাও হয়ে গেছে। সম্ভবত উৎপলেন্দুবাবুকে আপনি এ বিষয়ে বলেছিলেন। ত' এইসূত্রে কেউ কেউ বোধহয় মনে করছেন যে আপনার স্ট্যান্ডের হয়ত কিছুটা পরিবর্তনও হয়ে থাকবে। একটু খুলে বলবেন কি ?

উঃ স্ট্যান্ড মানে এটা আমার দিক থেকে খানিকটা রাগেরও কথাছিল। একজন এরকমভাবে বার বার বলবে যে দারিদ্র্য সম্বন্ধে সদ্‌গতি ধরনের ছবি করা উচিত নয় যেখানে দারিদ্র্য হচ্ছে আমার দেশের সমাজ জীবনে সবচেয়ে বড় একটা ফ্যাক্ট। কাজেই আমার মনে হয়েছে যে সে সম্বন্ধে ছবি করা উচিত। যেহেতু মন্ত্রী বলেছেন যে করা উচিত নয় তাই সেটাকে কন্‌ফ্রন্ট করতে হলে কাজটা করে দেখতে হবে কদ্দূর কি যায়।

প্রঃ হাঁা, আপনি বোধহয় বলেছেন যে আপনার পজিশনে, আপনার পক্ষে...

উঃ হয়ত আমার পক্ষে রাস্তাটা দেখানো সম্ভব। অন্যরা অনেকেই এখনও সে জায়গাটাতে আসেনি এবং আমি যদি করে দেখাই তাহলে তারা তখন সেইটে ফলো করতে পারবে। আমরা যারা বেশকিছুকাল ধরে কাজ করছি এবং যাদের মোটামুটি একটা প্রতিষ্ঠা মত হয়েছে তারা যদি জোরের সঙ্গে এ ধরনের জিনিসটা করে দেখায় তাহলে তরুণদের সুবিধা হতে পারে।

প্রঃ এবং সামগ্রিকভাবে আপনি মনে করেন যে এ ধরনের কন্‌ফ্রন্টেশনের সুযোগ যে একেবারেই নেই তা ঠিক নয় ?

উঃ হাঁা, সুযোগ একেবারেই পাওয়া যাবেনা কিংবা জোর করে করতেই দেওয়া হবেনা এটা ঠিক নয়।...

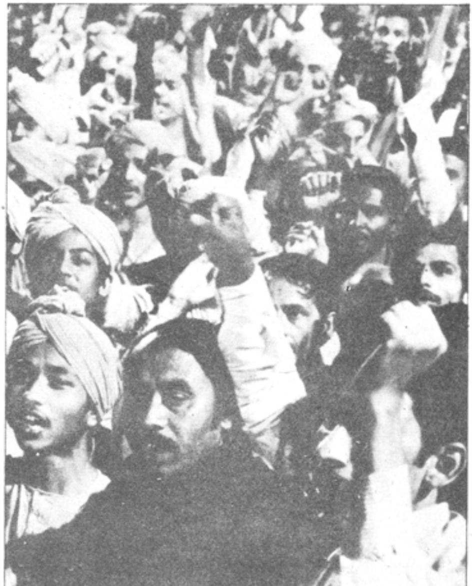

দিল্লির পরিবহন

অমিত রায়

স্বাধীনতার সময় দিল্লি শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৮ লাখের কাছাকাছি। যানবাহন বলতে ছিল প্রধানত টাঙগা এবং সাইকেল। এছাড়া পুরানো দিল্লির কিছুটা জায়গায় চলতো একবগির ট্রাম। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দিল্লিতে বাসের সংখ্যা ছিল খুবই কম। দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাব থেকে লোকেরা বিপুল সংখ্যায় চলে আসতে লাগল এবং স্বাধীন ভারতের রাজধানী হিসাবে দিল্লির গুরুত্ব ভীষণ ভাবেই বেড়ে গেল। নানান প্রদেশ থেকে আসতে লাগল মানুষজন। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ পুরানোকালের টাঙগা আর সামলাতে পারছিল না। এল চার যাত্রীবাহী থ্রি হুইলার ভটভটি। তারপর ক্রমশঃ আরো ট্যাকসি এবং দুই যাত্রীবাহী থ্রি হুইলার। মানুষের চাহিদা মেটাতে আস্তে আস্তে বাসেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তবে সংখ্যায় তা খুবই নগণ্য। ১০ বছর আগেও দিল্লি শহরে বাসের সংখ্যা ছিল খুবই অপ্রতুল।

গত দশ বছরে দিল্লিতে বাসের সংখ্যা বেশ উল্লেখজনক বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে দিল্লিতে বাসের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৬৯২ টি। বর্তমানে দিল্লি পরিবহন নিগমের আওতায় বাসের সংখ্যা ৫২০০-এর মধ্যে সরকারি বাস চার হাজারের মত। আর বেসরকারি বাসের সংখ্যা ১২শ'-র মত। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লিতে বেসরকারি বাস চলে দিল্লি পরিবহন নিগমের কর্তৃত্বাধীনে। এই ৫২০০-টির মত বাসের কিছু যান্ত্রিক কারণে বসে গেলেও বর্তমানে দৈনিক প্রায় পাঁচ হাজারের মত বাস রাস্তায় চলছে।

দিল্লিতে পরিবহনের জন্য বাসের প্রবর্তন করেন একটি বেসরকারি সংস্থা-গোয়ালিয়ার এণ্ড নর্দান ইণ্ডিয়া ট্রানসপোর্ট কোম্পানি লিমিটেড। ১৯৪৮ সালে তাদের হাত থেকে নিয়ে পরিবহনের দায়িত্বে আসে দিল্লি রোড ট্রানসপোর্ট অথরিটি। ১৯৫৭ সালে আবার তার হাত থেকে নিয়ে দায়িত্বভার দেওয়া হয় দিল্লি ট্রানসপোর্ট আণ্ডারটেকিংকে (ডি.টি.ইউ)। ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় জাহাজ এবং পরিবহন মন্ত্রকের অধীনে গঠিত হয় দিল্লি ট্রানসপোর্ট করপোরেশান (ডি.টি.সি)। সেই থেকে দিল্লিতে পরিবহনের দায়িত্বে রয়েছে দিল্লি ট্রানসপোর্ট করপোরেশান।

দিল্লির বাসগুলি দৈনিক প্রায় ৯ লাখ কিমি পথ পরিক্রমা করে থাকে এবং দৈনিক প্রায় ৪০ লাখ যাত্রী বহন করে। বর্তমানে দিল্লি শহরের জনসংখ্যা ৭০ লাখের মত। টিকিট বিক্রি থেকে ডি.টি.সি-র দৈনিক আয় ১৭.৫৯ লাখ টাকা হলেও লোকসানও ভাল রকমের। ডি.টি.সি-র ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে প্রতি কিলোমিটার দৌড়ের জন্য করপোরেশানের লোকসান দিতে হচ্ছে ৩ টাকা ২ পয়সা। কারণ প্রতি কিলোমিটার বাস চালানোর খরচ পড়ে ৫.৩৭ পয়সা। সেই জায়গায় তার আয় হয় কিলোমিটার প্রতি ২ টাকা ৩৫ পয়সা। অর্থাৎ ৩ টাকা ২ পয়সার ঘাটতি।

এই লোকসানের অন্যতম কারণ হল বেশ কয়েক বছর ধরে ডি.টি.সি-র বাসের ভাড়ার কোন পরিবর্তন করা হয়নি। সর্বনিম্ন ভাড়া হচ্ছে ৩০ পয়সা, তারপর ৪০ এবং ৫০ পয়সা। কতকগুলি ক্ষেত্রে আরও বেশি ভাড়া রয়েছে বটে তবে সাধারণতঃ জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে যতটা রাস্তা যাতায়াত করতে হয় তা ঐ ৫০ পয়সার মধ্যেই সেরে ফেলা যায়। একজন যাত্রী ৫০ পয়সা দিয়ে অন্ততঃ ১২ থেকে ১৫ কি.মি. পথ যেতে পারেন। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের অন্য কোনও বড় শহরে বর্তমানে বাসের এত কম ভাড়া আর কোথাও নেই।

এই কম উপার্জনের জন্য ডি.টি.সি ধারের কিস্তি বা ধারের ওপর দেয় সুদের টাকা ঠিকমত মিটিয়ে দিতে পারছেনা। ১৯৮২-৮৩ সালের আর্থিক বছরে ডি.টি.সি-র বকেয়া ধারের পরিমান ছিল ২০,৬৫৭.৬২ লাখ টাকা।

আগেই জানিয়েছি যে দিল্লির বেসরকারি বাসগুলি চলে দিল্লি পরিবহন নিগমের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে এবং কিলোমিটারের ভিত্তিতে। আনকোরা নতুন বেসরকারি বাস রাস্তায় চালু করার সময় থেকে ৩ বছর পর্যন্ত কিলোমিটার প্রতি ২.৩০ টাকা হিসাবে পায় ডি.টি.সি-র কাছ থেকে থেকে ৩ বছর পর্যন্ত ডি.টি.সি দিয়ে থাকে কিলোমিটার প্রতি ২ টাকা এবং ৩ বছরের পর থেকে ১.৮০ টাকা। বেসরকারি বাস ছাড়াও আছে কতকগুলি রুটে মিনি বাস। প্রাইভেট বাসের ভেতর কমবেশি প্রায় বেশির ভাগ রুটেই আজকাল চলছে ডিলাক্স বাস। পুরু গদি মোড়া আরামদায়ক বাস। যাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য চলতি বাসে ক্যাসেটে গানের ব্যবস্থা। এগুলির ভাড়া ফ্ল্যাট রেটে এক টাকা করে।

দিল্লি শহর খুবই ছড়ানো বলে শহরের দূরবর্তী এলাকা থেকে ডি.টি.সি. চালু করেছেন আর এস সার্ভিস। অর্থাৎ রেলওয়ে স্টেশান সার্ভিস। এই বাসগুলির ভাড়া ফ্ল্যাট রেটে এক টাকা করে। বাসগুলির কিছু যায় নতুন দিল্লিতে আবার কিছু যায় পুরানো দিল্লিতে। কোন কোন পুরানো দিল্লিগামী বাস নতুন দিল্লি স্টেশানও ছুঁয়ে যায়। এতে যাত্রীরা অল্প পরিমান মালপত্রও নিয়ে যেতে পারেন।

সাধারণতঃ দিল্লিতে সাধারণ রুটের বাস চলে রাত্রি দশটা-সাড়ে দশটা পর্যন্ত। রাত্রি ১১ টা থেকে শুরু হয় নাইট সার্ভিস। ১১ টা থেকে প্রতি ঘণ্টা অন্তর অন্তর। চলে রাত প্রায় ৪ টে পর্যন্ত। এগুলি সচরাচর চলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট বেসিসে। অর্থাৎ কোন এলাকা থেকে রেলওয়ে স্টেশান পর্যন্ত বা আই. এস. বি টি পর্যন্ত (আর্ন্তরাজ্য বাস টার্মিনাস)। পথে হাসপাতাল ছুঁয়ে যায়। এগুলিরও ভাড়া ১ টাকা করে, দিল্লিতে রাত্রে স্কুটার পাওয়া বেশ ভাগ্যের ব্যাপার। ট্যাকসিও সর্বত্র মেলে না। তাছাড়া তারা ভাড়া অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা সচরাচর দাবি করে থাকে। সেদিক থেকে নাইট সার্ভিসগুলি লোকের বেশ ভাল রকম উপকার করে।

ডি.টি.সি-র কর্মীসংখ্যা বর্তমানে ৩৮,৫০০। বাস পিছু কর্মী সংখ্যার অনুপাত প্রায় ১০ জনের মত। দিল্লি শহরে ২০টি মত বাস ডিপো রয়েছে। দুটি কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ। একটি উত্তর দিল্লিতে অন্যটি দক্ষিণ দিল্লির ওখলাতে। এ বছরে শহরে ৬৪টি নতুন রুট এবং ৭টি আন্তঃ রাজ্য বাসরুট চালু করা হয়েছে। নির্মান করা হয়েছে ৪০০টি নতুন বাস কিউ শেলটার এবং ২৬টি টাইম কিপিং বুথ।

আন্তঃ রাজ্য পরিবহন ব্যবস্থায় ডি.টি.সি-র ২০০টির মত বাস চলছে। দিল্লি থেকে পাঞ্জাব, হরিয়াণা, জম্মু এবং কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য

প্রদেশ যাতায়াতের জন্য এখানেই ব্যবস্থা রয়েছে আই এস বি. টি-তে। ডি.টি.সি-র বাস ছাড়াও এইসব রাজ্যগুলিতে যাতায়াতের জন্য রয়েছে ভিডিও কোচ এবং বাতানুকূল বাস। সব বাসই এই আই এস. বি টি থেকে ছাড়ে।

দিল্লিতে ডি.টি.সির বাস ছাড়াও দূর দূর এলাকা থেকে অফিস যাবার এবং ফিরে আসার সময় পাওয়া যায় চার্টার্ড বাস। এই বাসগুলি সকাল এবং বিকেলের নির্দিষ্ট সময়ে মাসিক ভাড়ার চুক্তিতে যাত্রীবহন করে থাকে। সব মিলিয়ে দিল্লি শহরে চার্টার্ড বাসগুলি বেশ ভাল সংখ্যক অফিসযাত্রী বহন করে থাকে।

দিল্লির পরিবহন ব্যবস্থায় রিং রেলওয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ শহরের আকৃতি এবং পরিধি অনুযায়ী রিং রেলওয়ের আওতায় স্টেশানের সংখ্যা বেশ কম। তাছাড়া স্টেশানগুলি থেকে যাতায়াতের জন্য ডি.টি.সির ফীডার সার্ভিসও নাম মাত্র। মূল সরকারি অফিসগুলিতে যাতায়াতের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্টেশান থেকে নেমে আবার বাসে উঠতে হয়। দুবার করে ট্রেন এবং বাসের ধকল সইতে নারাজ যাত্রীরা—বিশেষতঃ তাড়াহুড়োর সময়। বাসের ভাড়া অনুপাতে রিং রেলওয়ের ভাড়া অনেক বেশি—ফ্ল্যাট রেটে ১ টাকা। তাই নানান কারণে রিং রেলওয়ে দিল্লিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য মাঝে মাঝে প্রস্তাবও দেওয়া হচ্ছে রেল কাম বাসের টিকিটের।

আন্দাজ করা হচ্ছে যে ২০০০ খৃষ্টাব্দের শেষে দিল্লি শহরের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখের মত। এখনই দিল্লি শহরের ট্রাফিক ডেনসিটি খুবই বেশি। তাই নিয়ত বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কি ভাবে মেটানো যাবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি ইতিমধ্যেই ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন।

এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও ডি.টি.সি-র বিরুদ্ধে লোকের নানান অভিযোগ। অফিস যাবার সময় এবং অফিস ছুটির সময় ছাড়া অন্য সময়ে বাসের ঘন ঘন সার্ভিস তেমন থাকে না। অবশ্য কতকগুলি রুট ছাড়া অন্যান্য রুটে যাত্রীর অভাব তার একটা প্রধান কারণ হতে পারে। তবে অফিস যাতায়াতের সময়ে বাসের সংখ্যা বেশ ভালই এবং সময় মাফিক। অনেক স্পেশাল বাসও ঐ সময়ে চালু করা হয়। অন্যান্য সময় বাসের জন্য প্রায় ২৫ মিনিট থেকে ৩০-৩৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। দিল্লির বাস সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যেটি সেটি হল বাসের চালক এবং কন্ডাকটাররা যাত্রীদের প্রতি নজর দেয় না ঠিকমত। বাস স্টপেজে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ছেড়ে দেয়। স্টপেজে অপেক্ষমান যাত্রীদের হয় কিছুটা আগে নয়ত বেশ কিছুটা পরে গিয়ে বাস থামায় ড্রাইভারেরা। ফলে শিশু, মহিলা সহ সকল যাত্রীদেরই বাসে ওঠবার জন্যে প্রাণপণে দৌড় শুরু করতে হয়। আর বাসের স্টপেজে দাঁড়াবার যেহেতু কোনো স্থিরতা নেই তাই বাধ্য হয়ে যাত্রীদের ভেতর ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া অনেক সময় দেখা যায় স্টপেজে অন্য কোন বাস দাঁড়ান থাকলে আগত বাসগুলি স্টপেজে না থেমেই চলে যায়। অবশ্য সব বাসগুলিই যে এমন করে তা নয়। তবে দিল্লি বাস সম্পর্কে এটাই জনগণের সাধারণ অভিজ্ঞতা। তাই দিল্লির এলাহী পরিবহন ব্যবস্থা সত্ত্বেও অভিযোগেরও কমতি নেই। বদনাম ঘুচোতে কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কি একটু দৃষ্টিপাত করতে পারেন না? কারণ জনসুবিধার জন্যে তাদের সফল সৎ প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পাচ্ছে না সামান্য একটু ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে। □

নির্বাচনী জমাখরচ

নিজস্ব প্রতিনিধি

লোকসভার নির্বাচনে এ রাজ্যে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে বার কোটি টাকার মত। গোটা টাকাটাই যোগাবে কেন্দ্র। বিধান সভার নির্বাচনে ব্যয়ের অর্ধেক যোগাতে হয় রাজ্যকে।

ভোটের দিন যাঁরা কাজ করেন তাঁরা এই হারে ভাতা পান ঃ প্রিসাইডিং অফিসার – ১০০ টাকা। পোলিং অফিসার – ৮৫ টাকা। প্রতিটি বুথে গড়ে ব্যয় ৩৫৫ টাকা। মোট কর্মীর সংখ্যা সাড়ে তিন লাখের মত। এই বাবদই ব্যয় তিন কোটি টাকার মত।

লরি, বাস, মিনি বাস, প্রাইভেট কার প্রভৃতি ভাড়া করা হয় যথাক্রমে দিনে ১৫০, ১৫০, ৭৫ এবং ৬০ টাকা হারে। পেট্রোল যোগান রাজ্য সরকার। সে টাকাটা এই বার কোটি টাকার বাইরে। পরে কেন্দ্র মিটিয়ে দেন।

প্রতিটি বুথের জন্য চট, কাঠ, ডাসটার দড়ি, ব্লেড, কারবন পেপার, পেনসিল, ডটপেন, ভোটের কালি, ইনক প্যাড, গালা, লণ্ঠন প্রভৃতি। প্রতিটি বুথের জন্য কনটিনজেন্স বাবদ একশত টাকা আগাম দেওয়া হয়। এই টাকাটার হিসেব পাওয়া মুশকিল। চট, কাঠ, প্রভৃতি যোগান সরকার। নির্বাচনের পর এগুলো আর ফেরত পাওয়া যায় না। প্রতিটি বুথে ব্যালট বাক্স মুড়তে তিন মিটার করে মার্কিন কাপড়, পিচ বোর্ড আর কাগজ পাঠানো হয়। এরও কোন হিসেব থাকে না। একমাত্র ব্যালট বাক্সগুলোরই হিসেব থাকে। পরে কাজে লাগেও।

ভোট গণনার সময় প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতিটি টেবিল সাজানোর জন্য কাঠের বাক্স এবং ব্যালট পেপারগুলোর বাণ্ডিল বাঁধবার জন্য কয়েক কুইনটাল গার্ডার লাগে। লাগে হাজার হাজার দিস্তা কাগজ, ডটপেন, কারবন পেপার, পিন প্রভৃতি।

ছাদের উপর মেরাপ বেঁধে গণনার কাজ চলে। তার জন্য ডেকরেটরদের কাছ থেকে চেয়ার, টেবিল, পাখা, আলো, সাদা চাদর প্রভৃতি লাগে। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য লাগে জেনারেটরও।

রাজ্য সরকারকে যোগাতে হয় জীপ গাড়ি এবং কর্মচারী। চারটি বুথ নিয়ে একটি স্টেশন। সেখানে একজন করে রাইফেলধারী পুলিশ এবং একজন লাঠিধারী পুলিশ থাকবেই। পুলিশের গাড়ি, ভাতা এবং আহার্য যোগান পুলিশ দপ্তর। সে হিসেব-এর বাইরে। □

রাইটার্সে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে মান

বিশেষ প্রতিনিধি

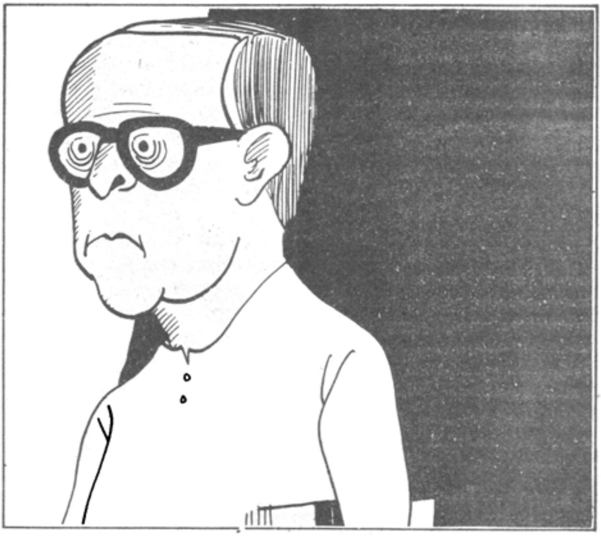

ইদানিং সারা শহরজুড়ে একটা ব্যাপার নিয়ে বেজায় তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে সেটা হল প্রাক্তন আই পি এস অফিসার পুলিশ সুপার এস এস মানের সঙ্গে জ্যোতি বাবু মহাকরণে বৈঠক করেছিলেন কিনা। দরবারা সিং অবশ্য বলেছেন যে জ্যোতিবাবু মানের সঙ্গে মহাকরণে বৈঠক করেছিলেন। জ্যোতিবাবু চেনেন মানকে। তবে জ্যোতি বাবু এবং সরোজ বাবু দুজনেই এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, না মানের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর দেখা হয় নি। জ্যোতিবাবু মানকে চেনেন না।

কিন্তু ওঁরা যাই বলুন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা'র প্রধানমন্ত্রীর রাজীব গান্ধীর কাছে এক গোপন রিপোর্টে বলেছেন মান মহাকরণে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শিখ সমন্বয় কমিটির নেতা কামেক্কর সিংহের নেতৃত্বে একটি দল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকান্ডের পর শিখদের নিরাপত্তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে কামেক্কর সিং-রা সেখানে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল এস. বি। ওদের সঙ্গে ছিল এস এস মানের একটি ফটো। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী কিংবা এস বি-র লোকেরা তাঁকে চিনতে পারে নি এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে নিছক নিরাপত্তা নয় গোপন কথা আলোচনার জন্য কামেক্কর সিং তাঁকে জ্যোতিবাবুর কাছে নিয়ে যান। কামেক্কর সিং কলকাতার একটি বিশিষ্ট পরিবহন সংস্থার মালিক। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁর বিরাট বাড়ি। মান এই বাড়িতেই উঠেছিলেন। কামেক্কর তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

'র'য়ের গোপন রিপোর্ট আরও বলা হয়েছে ইন্দিরা হত্যার জাল বোনা হয়েছিল পাঞ্জাব এবং কলকাতায়। ইন্দিরার অন্যতম আততায়ী বিয়ন্ত সিংয়ের সঙ্গে ছিল মানের ঘনিষ্ঠতা। বিয়ন্ত একসময় তাঁর কাছে কাজ করত। ইন্দিরা হত্যাকান্ডের চক্রান্তের জাল বুনে মান চলে আসেন কলকাতায়। বিভিন্ন গুরুদ্বারে তিনি রাত কাটান। এখানে এসে কলকাতা পুলিশের কয়েকজন ডিসি এবং রাজ্যপুলিশের এক ডি আই জির সঙ্গে কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎও করেন। আই টি এফ প্যাভিলিয়নে খালিস্তানীদের যে সভা হয় তাতে মান বেশ সক্রিয় ভূমিকা নেন। এসবই কিন্তু হয়েছে এস বি'র অফিসারদের চোখের সামনে। কিন্তু ওঁরা কোন ব্যবস্থাই নেননি ওঁদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন? তাহলে কী সরকারি নির্দেশ ছিল ওঁদের গায়ে হাত না দেবার। অথচ মুখ্যমন্ত্রী নাকি কিছুই জানতেন না। কিন্তু এস বি অফিসাররা বলতেন, মুখ্যমন্ত্রী সবই জানেন। মহাকরণের বৈঠকে যে মান ছিলেন তাও মুখ্যমন্ত্রীর জানা ছিল। কিন্তু এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা হচ্ছে। মানের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি থেকে যে ডায়েরিটা পুলিশ পেয়েছে তাতে বিয়ন্ত সিংয়ের নাম ছিল। নেপালে যাবার চেষ্টা করাটাই মানের কাল হল। বিহার-নেপাল সীমান্তে কামেক্কর সিং এবং আরও দুই শিখ ধরা পড়লেন। বিহার পুলিশের যোগবানী থানার সিপাই পুলিশ সাহেবকে ধরে ফেলে।

কিন্তু কলকাতা পুলিশের এস বির বেহাল অবস্থার এতটুকুও উন্নতি হয়নি। শিখ সেলে কোন পাঞ্জাবি নেই। পেশোয়ার সিং বলে একজন ইন্সপেক্টর এই সেল চালাতেন। কিন্তু তাঁর অবসর নেবার পর শিখ সেল একদম ঝিমিয়ে পড়ে। পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের গোলমালের সময়েও ঐ সেলকে চাঙ্গা করা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর শিখ সেলকে নাড়া চাড়া দেওয়া হয়। কয়েকজন তরুণ গোয়েন্দা অফিসারকে ঐ সেলে সম্প্রতি আনা হয়েছে। তবে এই সেলে এখনো পর্যন্ত কোন শিখ অফিসার নেই। কেউ গুরুমুখী ভাষাও জানেনে না। ঐ সেলের পুলিশরা এখন গুরুমুখী শিখছেন।

এদিকে হরিশ মুখার্জি রোডের বহু শিখ পাঞ্জাবে পাড়ি দিয়েছেন ভবানীপুর, মহাত্মাগান্ধী রোড এবং মানিকতলা এলাকা থেকে বহু শিখ তাঁদের পরিবার বর্গকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হরিশমুখার্জি রোডের একটি ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক লাখ টাকা চলে গিয়েছে পাঞ্জাবে। খালিস্তানী ফান্ডে টাকা যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক থেকে ওভার ড্রাফট নিয়ে শিখরা পাঞ্জাবে এই টাকা পাঠাচ্ছেন। ভোটের আগে লরির কনভয় ছুটেছে পাঞ্জাবে। রাতের অন্ধকার লরি চেপে শিখরা জিটি রোড ধরে পাঞ্জাবে পাড়ি দিয়েছেন। পুলিশের একটি মহলের হিসেব মত শিখ সম্প্রদায়ের হাজার দশেক লোক এর মধ্যে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছেন বেশ কিছু ট্যাক্সির হাতবদল ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। হরিশ মুখার্জি রোডের দুটি হোটেল আপাতত বন্ধ। ওদের মালিক ঝাপ বন্ধ করে খালিস্তানী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কোন বাঙালি সন্তান হোটেল কিংবা ট্যাক্সি কিনবার জন্য হাত বাড়ান নি। খালিস্তানীদের হাত থেকে রাজস্থানীদের হাতে পড়ছে দোকান পাট আর ট্যাক্সির লাইসেন্স। বড়বাজারের মারোয়াড়িদের ব্যবসা এ শহরে আরও জাঁকিয়ে চলছে। □

সংবাদ বিসংবাদ

ঠুঁটো জগন্নাথ লালবাজার!

লালবাজারের ঠিক উল্টো দিকে ১৯ ডিসেম্বর মাঝরাতে একটি খ্যাতনামা চা বিক্রেতার অফিসে একটি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায়। দু পক্ষই বিত্তবান। মাড়োয়ারি। কথা কাটাকাটি থেকে মারামারি। একজন একটি পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারলেন। যাঁকে লক্ষ্য করে মারা, তিনি একটু সরে গেলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার আততায়ী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন না। প্রতিপক্ষের ওষ্ঠের উপরিভাগে গিয়ে লাগল। রক্তাক্ত লোকটি ছুটলেন। একেবারে লালবাজারে।

একজন ঝানু ইনসপেকটরের দাপট বোঝা গেল। তিন ভাইকে তিনি গ্রেপ্তার করলেন। কিন্তু লালবাজারের কথা এই জমানায় শেষ কথা হতে পারে না। একটু পরেই একটি টেলিফোন এল। শাসক দলের বড় চাঁই। একটি টেলিফোনেই লালবাজার কাৎ। তিন ভাই মুক্তি পেলেন। কোন এনট্রিও হল না।

লালবাজার থেকে মুক্তি পাবার সময় ওরা কথা দিয়েছিলেন, ইনসপেকটর সাহেব ডাকলেই ওঁরা হাজির হবেন। ইনসপেকটর ডেকেছেন, কিন্তু ওঁরা আসেননি।

যিনি ফোন করে লালবাজারকে অচৈতন্য করে দেন, তাঁর সম্পর্কে এক পুলিশ অফিসারের মন্তব্য ঃ ইনি ধনীদের চেয়েও ধনী এবং ক্ষমতায় মুখ্যমন্ত্রীরও উপরে!

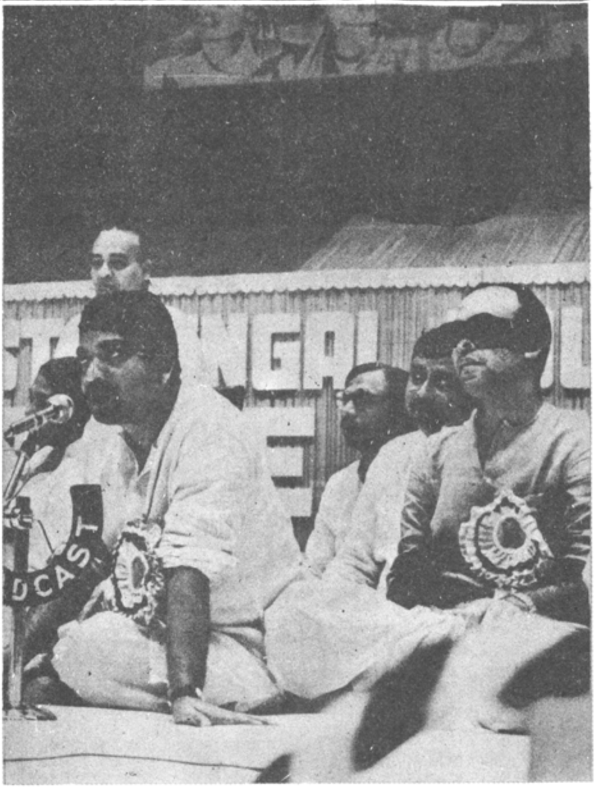

ভোটের বাজারে মানুষের হাতে ঘায়েল হয়েছেন অনেকে। কংগ্রেসেরই শতাধিক। কয়েকজনের এন্তেকালও হয়েছে। বামফ্রন্টের হত অথবা আহতদের কোন তালিকা পাওয়া যায়নি।

মানুষ নয়, ঈশ্বরের হাতে এই বাজারে দুটি মৃত্যুর খবর আছে। প্রথম জন বীরেন মহান্তি! যুব কংগ্রেস নেতা। নির্বাচনী সফরে বেরিয়েছিলেন, মোটর দুর্ঘটনায় হঠাৎই মৃত্যু হয়। কলকাতায় দু:সংবাদটি যেদিন পৌঁছয়, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সেদিন কলকাতায়। তিনি বীরেনবাবুর বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। কলকাতা পুলিশের আপত্তিতে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু শ্মশানে এবং শ্রাদ্ধবাসরে যুব নেতাদের, এই নির্বাচনী উন্মাদনার মধ্যেও আটকানো যায়নি। শ্রাদ্ধবাসরে প্রিয়-সুব্রত-সোমেনের পাশে ছিলেন মিঠুও। দিল্লি থেকে দেবপ্রসাদ রায় এসেছিলেন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদানের জন্যই। বীরেন মহান্তির স্ত্রী শীলা মহান্তি, অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়ের পাশে বসেছিলেন যুবনেতারা। বীরেনবাবুর সঙ্গে শনিবারের চিঠির একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কয়েকবার আমাদের অফিসেও এসেছেন। ব্যথিত আমরাও।

ভোট দেওয়া হয়নি মন্মথ মুখোপাধ্যায়েরও। বেঙ্গল হোসিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা। পোড়খাওয়া মানুষ। ভোট দিতে যাবেন। তৈরি হচ্ছিলেন। হঠাৎই বুকে ব্যথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রখ্যাত কবিরাজ স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্রের সব শেষ। হোসিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের অন্য সদস্যরা ভিড় করেছিলেন নিমতলায়। তবে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন।

নতুন মন্ত্রিসভায় কে কে স্থান পাচ্ছেন? এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল যুব নেতা দেবপ্রসাদ রায় এম পিকে। জবাবটা বেশ জুতসই ছিল ঃ সেটা জানেন শুধু রাজীব। মন্ত্রিসভার নবীন অথবা প্রবীণ কোন সদস্যই কিছু জানেন না। আমি তো জানিই না। □

নূপুরের মতো

অনুলিখন ঃ অনুপমা দাশ

একবার [illegible]র পর বাড়ি এসে চেইন হাতে নিয়ে খাঁচার ভিতর ঢুকেছি, আর ও গায়ের উপর এসে পড়ছে। আমি বাড়ি সব সময় না থাকার ফলে ওর প্রতি সকলে সহৃদয় ব্যবহার করতো না, আদর করা ত দূরের কথা। কাজেই লক্ষ করেছিলাম ওর স্বভাবটা একটু হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বাড়ি এসে শুনেছিলাম, যে খাবার দেয় তার গোড়ালি থেকে খানিকটা মাংস নাকি ও তুলে নিয়েছিল আঁচড়ে! যাই হোক, আমাকে দেখে ও খুব খুশি হয়েছিল। গায়ের উপর পড়ছে, খেলা করছে, আমিও হাতের চেইনটা দিয়ে টুকটুক করে ওর গায়ে মারছি খেলার ছলে। হঠাৎ ওর ঠিক মাথার উপর দু'চোখের মাঝখানে বেকায়দাভাবে জোরে লেগে গিয়েছিল চেইনটা, সঙ্গে-সঙ্গে ওর চোখের চেহারাটা পাল্টে গিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল। দুপাশের দাঁত বার করে গলায় গর-গর্-গর্-গর্ ক্রুদ্ধ গর্জন করতে লাগল। দু'থাবা পেতে মাটির উপর চেপে বসে যেন যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়ে রইল। তা দেখে আমার ত আত্মারাম খাঁচাছাড়া! চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম স্থির হয়ে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনা। কিন্তু তাতে কাজ হলো। ওর চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে এলো। আমি একটু নড়লেই ও চার্জ করতো। আমি তখন খাঁচার ভিতর! পালাবার পথ নেই! ও একটু শান্ত হতে ধীরে-ধীরে পিছু হটে বেরিয়েই দরজা বন্ধ করে দিলাম।

বুঝতে পারলাম, এতদিন বাইরে না বেরোতে পারায় আর মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়ায়, তার উপর অতর্কিতে চেইন-এর আঘাতে মুহূর্তের জন্য সংযম হারিয়ে ফেলেছিল টিবু। কিন্তু তারপরেই আবার যেন কত লজ্জিত হলো।—তাই আদর করে ডাকতে লাগল, দু'চোখে ওর জল, যেন ক্ষমা চাইছে।

আমিও ওর অবস্থা দেখে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর মাথায় এবং গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। আর ও ধীরে-ধীরে আমার কনুই পর্যন্ত মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে জিভ দিয়ে আদর করে বারে-বারে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।—যেন বলছে, 'আর কখনও হবে না, বন্ধু, ক্ষমা করো।'

বম্বেতে জে. জে. স্কুল অব আর্টে ভর্তি হবার আগে ঐ জিপসি, টিবু এবং রাজকুমারের সঙ্গে টেনিস, র‍্যাকেট ইত্যাদি খেলেই আমার সময় কাটত।

আগেই বলেছি-ঝালাওয়াড়ে আমাদের বাড়িটা ছিল বিরাট। দোতলা বাড়ির বড়-বড় উঁচু ঘর, চওড়া বারান্দা, বিরাট লন এবং বাড়ির ভিতরের দিকে বিরাট বাগান। তারই একপাশে আমার চিড়িয়াখানা। এই বাগানেরই একপাশে আস্তাবল, তেজি সুন্দর ঘোড়ায় ভরা। কোনটা শুধু বাবার ফিটন্ গাড়ি টানে। কোনটা বা পিঠে বাবাকে সওয়ার করে তাঁর ইঙ্গিতমত চলাফেরা করে।

প্রথম প্রথম ঝালাওয়াড়ে এসে আমার ভীষণ ঘোড়ার পিঠে চড়তে ইচ্ছে করতো, অথচ তখন আমি বেশ ছোট। একদিন হঠাৎই লাফ দিয়ে চড়ে বসবার চেষ্টা করেছিলাম একটা ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু সেই তেজি ঘোড়া তার পিঠের উপর আমার মত এক আনাড়ি ও নতুন সওয়ারকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারেনি। তাই পিছনের দু'পা তুলে বেকায়দা দাপাদাপি লাগিয়ে দিল এবং আমার পক্ষে আর সম্ভব হোল না ভারসাম্য বজায় রেখে বসে থাকা। তাই সশব্দে মাটিতে পড়ে গেলাম। পড়েই দেখি ঘোড়াটা তেড়ে আসছে লাথি মারার জন্য। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কাছের বাবলাগাছেই উঠে পড়লাম। বাবলার কাঁটার খোঁচায় সারা গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

ঝালাওয়াড়েই আমার হতে খড়ি হয় অস্ত্রর সঙ্গে। বাড়িতে ছিল অসংখ্য তরবারি, ছিল বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি অনেক অস্ত্র। শুধু মন্ত্রীর বাড়ি বলে নয়, ঝালাওয়াড়ের প্রতিটি রাজপুত গৃহেই ছিল অস্ত্রসম্ভার। তাদের এক জনপ্রিয় উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান অস্ত্রপূজা। দুর্গাপূজার সময় প্রতিমার সামনে হয় এই অনুষ্ঠান। মহারাজার সম্ভার থেকে বার করে আনা হয় কত 'ইতিহাস বিখ্যাত অস্ত্র, শত্রু-রক্ত রাঙা কৃপাণ!

আরেকটি মজার খেলা ফাটা বাজি—ভদ্রঘরের ছেলেরা যখন তখন খেলার ছলে তলোয়ার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়।

আমিও খেলেছি এই খেলা। তবে বাড়িতে রাখা তলোয়ার নিয়ে একলা ঘরেই বেশির ভাগ সময় করতাম অসি চালনার অভ্যাস। সে-সময় সাক্ষী থাকতো শুধু কুকুর জিপ্সি।

বাবা আমাকে সে-সময়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন স্টেটের ব্যান্ডমাস্টার পিন্টো সাহেবের সঙ্গে।—তাঁর কাছে আমার বেহালা শেখার ব্যবস্থাও করেন। পিন্টো সাহেব বোধ হয় জাতে পর্তুগিজ। বড় ভাল লোক। আর কী মিষ্টি হাত বেহালার! বৃদ্ধ লোকটি তাঁর বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি নিয়ে বড় সুন্দর একটি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতেন। রোজ যেতাম তাঁর কাছে।-উনি খুব তারিফ করতেন আমার।

এই বেহালা শেখার সময় আমার কিশোর মন প্রথম ভালবাসে একটি মেয়েকে। সে "সুন্দরী।"

"তখন আমার বয়স বছর ষোল। ঐ বয়সেই ছেলেমেয়েদের মনে যে ভালবাসা আসে, তা সত্যি-সত্যি দৈবিক কিছু। জীবনের কোন তিক্ততা তখনও মনে আসেনি। সবে দুরন্তপনা ছেড়ে বড় হচ্ছি। ঐ সময় সুন্দরীকে মনে হয়েছিল দেবীর মতো।

পিন্টো সাহেবের বাড়ির দিকে যাচ্ছি সাইকেল চড়ে—হঠাৎ রাস্তার ধারে এক ছোট্ট বাড়ির বারান্দায় তাকে প্রথম দেখি। বোধহয় স্নান করে দাঁড়িয়ে ছিল। সোনার মত গায়ের রঙ, কালো লম্বা চুল, আর সারা মুখে একটা পবিত্রতা ছড়িয়ে আছে। সেই ষোল বছর বয়সে তার রূপের এই বিশ্লেষণ কিন্তু আমার মনে হয়নি। এমন কি জাহাজের সেই ভয়াবহতার মধ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি বসেও আমি এমন ভাবে বিশ্লেষণ করিনি—মনে হচ্ছে আজ, এই বৃদ্ধ বয়সে। যখন ভাবি কিশোর উদয়শঙ্কর কেমন মুগ্ধ হয়েছিল আর এক কিশোরীকে দেখে, তখন তাদের আমি তারিফ করি—যেমন অভিনন্দন জানাই সারা পৃথিবীর ছোটছোট ছেলেমেয়ের প্রথম পবিত্র প্রেমকে। সত্যিই তা দৈবিক। যে ছেলেমানুষী ও শুদ্ধতা ছিল আমার প্রেমের মূলধন, তার গল্পই বলব আজ।"

তারপরই দাদা আচমকা আমাকে বললেন, "কিন্তু অনুপমা, তার আগে বলতো তোর খবর কি? লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছিস নাতো?"

"আহা-হা, চটিস্ না। শেষকালে বিয়ে করে চলে গেলে আমি মুশকিলে পড়বো আমার ট্রুপ নিয়ে। আবার এক নতুন মেয়ে নিয়ে তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে তো? মুশকিল আমারই-"

শুনে বললাম, "আমি এবার সত্যিই রাগ করবো, দাদা!-আপনি বলুন তো গল্প? কি হলো সুন্দরীর তারপর?"

-"তারপর আর কি!" দাদা বলে চললেন, "কাছাকাছি একটা দোকানে ঢুকে জেনে নিলাম বাড়িটা কার এবং মেয়েটি কে?

ইত্যাদি। জানলাম, এক পুরোহিতের মেয়ে সুন্দরী।

সেদিন আর বেহালায় মন বসলো না। পিন্টো সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "তোমার আজ কি হলো উদয়?" আমি কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে বিদায় নিলাম তাঁর কাছ থেকে।

সেদিনের পর থেকে দিনের মধ্যে কতবার যে সাইকেল চালাতাম সেই রাস্তা দিয়ে তার ঠিক নেই। সুন্দরীর বাড়ির উল্টোদিকের মিঠাইয়ের দোকান থেকে শুধু-শুধুই মিষ্টি কিনতাম আর ভাবতাম, যদি একটু দেখা পাই ওর!

কখনও-কখনও বারান্দায় আসত। কখনও বা আসত না।—ও ত আর জানত না যে আমি ওকে দেখবার জন্য গিয়েছি, আমি ওকে ভালবাসি।

ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ওদের বাড়ির সামনে এসে শুধু-শুধু সাইকেলের বেল বাজাতাম জোরে-জোরে। হয়ত কোন সময় বেরিয়ে আসত। কিন্তু ওকে দেখলেই আমার ভীষণ লজ্জা করত। ওর দিকে তাকাতে পারতাম না।—অন্যদিকে তাকিয়ে সোজা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতাম।

মনে-মনে ভাবতাম—এমন কিছু করব যাতে সুন্দরী বোঝে আমার মনের কথা। ভেবে ভেবে কুকুর জিপ্‌সীকে তালিম দিয়ে সাইকেলে বসা অভ্যাস করালাম। তারপর শেখালাম যে ওর পেটে থাবড়া দিলে তিনবার ডাকতে। বাড়ির বাগানে চলল রিহার্সাল।

তারপর একদিন বেরোলাম জিপসিকে নিয়ে।—সুন্দরীর বাড়ির সামনে প্রথমে জোরে জোরে বাজালাম বেল ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। তারপর বুদ্ধিমান কুকুরের সফল শিক্ষার উদাহরণ ভৌ! ভৌ! ভৌ!

মনে আছে সুন্দরী দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। আর অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। ব্যস! আর আমি তাকাতে পারি না ওর দিকে।

এইভাবে চললো কিছুদিন। তারপর মনে হতে লাগল, এযেন এক ঘেয়ে হয়ে গেছে। অতঃপর নিয়ে পড়লাম টিবুকে।

চেইন বেঁধে সাইকেলের সংগে সংগে হাঁটা অভ্যাস করলাম। যাতে আমি সাইকেলে চড়ে চললেও ও আমার সংগে তাল রেখে রাস্তায় চলতে পারে। টিবুকে নিয়ে রাস্তায় বেরোনোর মত বিপজ্জনক রিস্ক নিতেও আমি ভয় পাইনি। কেননা এখন যেন মনে হয় সুন্দরীও একটু-একটু বোঝে আমার মনের ভাব। কাজেই ওর জন্য জীবনও তুচ্ছ করে দিতে পারি—ও জানুক আমি ওকে কত ভালবাসি।

রিহার্সালের পালা শেষ হলেই একদিন সত্যি-সত্যি বেরোলাম টিবুকে নিয়ে। টিবু চলল সাইকেলের পাশে-পাশে পায়ে হেঁটে সুন্দরীর বাড়ির দিকে। এ দৃশ্য দেখে শুধু সুন্দরী নয়, খেয়াল হোল, রাস্তার লোকও কৌতূহলে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে-সময় আমাকে দেখে সুন্দরীর মনে কী চলছিল জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছিল সুন্দরীর বিস্ময় আকর্ষণ করতে পেরেছি। আর কিযেন বিশ্ব জয় করে ফেলেছি! ছেলেমানুষি-!

এদিকে আমার বাঘ নিয়ে রাস্তায় বেরোনোর খবর বাবা ও মহারাজার কাছেও ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। বাবা খুব রাগ করেছিলেন। আর মহারাজা চিন্তিত হয়ে বলেছিলেন, "আর কখনই বেরিয়ো না। কেননা যদি কোন অঘটন ঘটে যায় তো দোষটা পড়বে আমাদের উপরই।"

সুন্দরী! সুন্দরী! আমার চিন্তা, কল্পনা, অবসর সময় সবটা জুড়েই রইল সুন্দরী। ভাবতাম, যেন গাছের তলায় দু' জনে দাঁড়িয়ে—ওকে মনে হোত দেবীর মত গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। আর আমি ওকে আমার মনের কথা জানাচ্ছি। ভাবতে-ভাবতে এতই তন্ময় হয়ে যেতাম যে, সারা দুনিয়াটাই মনে হোত সুন্দরীতে ভরা।

একদিন মা দুধ দিয়ে গেছেন। খাটের পাশে রাখা আছে দুধ। আমি শুয়ে-শুয়ে ভাবছি সুন্দরীকে। হঠাৎ একটা বেড়াল চুপিসারে এসে দুধটা কখন খেতে শুরু করেছে টের পাইনি। সহসা দেখতে পেয়ে 'বেড়াল' বলে না চেঁচিয়ে 'সুন্দরী' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। ভাগ্যিস কেউ শোনেনি।

এই ছিল আমার সংগে সুন্দরীর সম্পর্ক। একদিনও কথা নয়, এমনকি ভাল করে কাছে থেকে দেখিওনি ওকে। শুধু ও দাঁড়িয়ে থাকত বাড়ির বারান্দায়। আর আমি রাস্তার এপাশ দিয়ে চালিয়ে যেতাম সাইকেল।

তবু একদিন বড় আশ্চর্যজনকভাবে তাকে কাছাকাছি দেখতে পেয়েছিলাম।

আমাদের বাড়ির উপর-তলায় মায়ের সংগে আলোচনা করতে এসেছিলেন সেখানকার মহিলারা স্থানীয় মেয়েদের স্কুলের ব্যাপারে। আমি বাইরেই ছিলাম। বাড়ি এসে কি দরকারে উপরে উঠছি, আর দেখতে পেলাম উপর থেকে তরতর করে নেমে আসছে সুন্দরী। আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল দ্রুত।—আর আমি শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম তার যাওয়ার পথে।

এর কিছুদিন পরেই আমার বম্বে যাওয়া ঠিক হয়ে যায়। নতুন জায়গায় যাব, নতুন দায়িত্ব নিয়ে। প্রবেশ করবো এক বৃহত্তর জগতে। কাজেই মনটা খুব উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিল। মনের মধ্যে ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যাচ্ছিল সুন্দরীর প্রতি আমার একতরফা ভালবাসা। চঞ্চল মনটা যেন স্থির হয়ে এলো!

পিন্টো সাহেবের কাছে বেহালা শেখার সময় আমি নানান রকম ম্যাজিকের পরীক্ষা করেছিলাম। একবার রাজকুমার রাজেন্দ্র সিং-এর অনুরোধে রাজবাড়িতে ম্যাজিক দেখাই। তাসের ম্যাজিক, ছোটখাট জিনিস দিয়ে মজার মজার খেলা আর অবশেষে 'মেয়ে ও চোরের' একটি খেলা দেখাই। ভাই রাজেন্দ্রশঙ্কর আমায় সাহায্য করছিল সহকারি হিসাবে। শেষের খেলাটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। খেলাটা হোল এরকম-

বাড়ির দোড়গোড়ায় এক চৌকিদার পাহারা দিতে-দিতে ঢুলছে। সেই ফাঁকে এক চোর বাড়িতে প্রবেশ করে। বাড়ির ভিতর একটি মেয়ে প্রসাধনে রত। চোরটা অলক্ষ্যে মেয়েটিকে মাথায় আঘাত করে সংগে আনা এক বড়-সড় চটের থলির মধ্যে পুরে ফেলে। এদিকে মেয়েটির চীৎকারে দারোয়ান ছুটে আসে এবং মেয়েটিকে থলির মধ্যে থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু থলির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে স্বয়ং চোরটি, এবং তারপরই দারোয়ান মুখের পাতলা আবরণ সরিয়ে ফেলে—দেখা যায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে দর্শকবৃন্দকে। নিজের মাথা থেকে বানানো এই ম্যাজিকটি সকলের কাছেই খুব ভাল লাগতো। মহারাজ খুশি হয়ে আমাকে তাঁর লাইব্রেরি থেকে দেশ-বিদেশের ম্যাজিকের বই পড়তে দেন। সে-সব থেকে আমি অনেক ম্যাজিক শিখতে পেরেছিলাম।

কিন্তু, হায় ভগবান! যত ম্যাজিকই জানি না কেন, ভারত মহাসাগরের বুকের উপর এই অসহায় ছোট জাহাজের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার মত কোন ম্যাজিকই আমার জানা নেই।

যাই হোক, আবার একটু হেঁটে বেড়ানর চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু খিদেও পেয়েছে। গেলাম রান্নাঘরের দিকে। রাঁধুনিও অসুস্থ। শুধু ক্যাপ্টেন, পাঁচ-ছয়টি নাবিক ও একটি পরিচারক সুস্থ আছে। তাদের সংগে এমনকি ক্যাপ্টেনের সংগেও আলাপ ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে।

ক্যাপ্টেন ইংরেজ। সে আমাকে খুব তারিফ করত আমার সহ্য ক্ষমতা দেখে। নেভিগেটর-এর নানান গল্পও করত ক্যাপ্টেন। কি ভাবে ঢেউ-এর সংগে যুদ্ধ করে, বাতাসের গতি বুঝে তাদের চলতে হয় তা আমাকে বুঝিয়ে দিত। দিন-দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে। ভারত মহাসাগরের কী ভয়ংকর চেহারা! এভাবে বোধহয় আর কোনদিনও আমরা পৌঁছতে পারব না ইংলন্ডে। সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা জাহাজের। সেই সংগ্রামে ছোট জাহাজ এস. এস. পয়ালটির কৃতিত্ব যে কত তা সেদিন

বুঝিনি।

পরবর্তীকালে যখন কুইন মেরী, কুইন এলিজাবেথ, ইল দ্য প্যারী, ইল দ্য ফ্রান্স, ভলকানিয়া, লাবায়াথান, ব্রিটানিয়া ও নরমান্ডির মত বিশাল জাহাজে চড়েছি এবং ক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নাজেহাল হতে দেখেছি, তখন বুঝতে পেরেছি এস. এস. লয়্যালটি কত মজবুত। ভারত মহাসাগরের সে ঝড়ের কাছে পরবর্তীকালের ঝড় কিছুই নয়। অথচ একটা কুইন মেরির উপর পাঁচটা এস. এস. লয়্যালটি চাপান যেতে পারে। এস. এস. লয়্যালটি ভারতবর্ষের প্রথম জাহাজ, যে কিনা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল।

সাগরের বুকের উপর ঠিক একটা কর্কের মত ভাসতে-ভাসতে চলেছে আমাদের জাহাজ। এক একটা ঢেউ পাহাড়ের মত

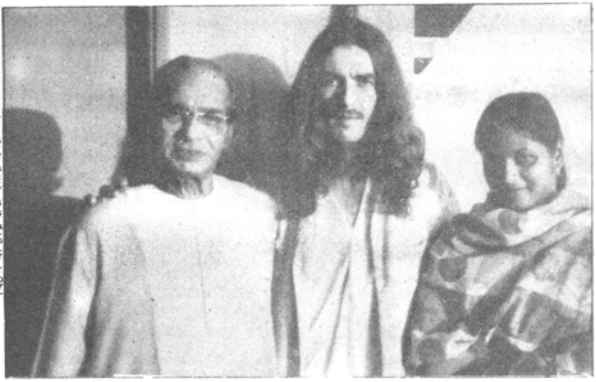

বিটল মাস্টার জর্জ হ্যারিসনের সাথে

দড়াম করে লাগছে জাহাজের গায়ে গর্জন করে প্রচন্ড শক্তিতে।

এক রাতে শুয়ে আছি ড্রয়িংরুমের একটি সোফাকে কোনমতে আঁকড়ে ধরে। হঠাৎ মনে হোল পুরো জাহাজটি যেন শূন্যে উঠে গেছে। আর তারপর, ওঃ ভগবান, খুব উঁচুতে উঠে ঘুরে সজোরে আছড়ে পড়ল জলের উপর। সে যা ঝাঁকুনি আর আওয়াজ—ছিটকে পড়ে গেলাম! বুঝতে পারলাম না কি হোল! কিন্তু এক প্রচন্ড আতঙ্কে ভরে গেল মনটা!

তারপর চললো একটানা উপর নিচ। পাশাপাশি সে পাগলের মতো দুলুনি। জলের সঙ্গে যেন যুদ্ধ। এইভাবেই রাত কাটল।

পরদিন ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাল রাতে কী হয়েছিল?" ক্যাপ্টেন বললে, "থাড! আর একবার যদি ওরকম হয় ত আমাদের কোন আশা নেই। জাহাজ টুকরো-টুকরো হয়ে তলিয়ে যাব। সাধারণতঃ একটি থাড-ই যথেষ্ট! আমরা যে কি করে টিকে আছি সেটাই আশ্চর্য, জলের ধাক্কায় জাহাজকে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট তুলে দেয়। আর আকস্মিক পাশ থেকে ঢেউ এসে জাহাজকে আছড়ে ফেলে ঐ উচ্চতা থেকে।" গত রাতের থাড শুধু যে আমাদের আছড়ে ফেলেছিল তাই নয়। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল বিপরীত দিকে, অর্থাৎ আবার বোম্বাই-এর দিকে। সেই জাহাজকে সোজা করতে সময় লেগেছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রতিটি ঢেউ-এর আঘাত ও তার গতি সব হিসাব করে ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে জাহাজকে ইউরোপের দিকে মুখ করাতে হয়েছে। আমরা খুব জোর বেঁচে গেছি। আবার যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে বিপদ। ক্যাপ্টেন নির্বিকার ভাবে বলে যাচ্ছেন, "কত জাহাজ তলিয়ে গেছে, কত লোকের সলিল সমাধি হয়েছে এমনি দুর্দান্ত ঝড়ের কবলে পড়ে!" শুনতে-শুনতে ভয় ও আতঙ্ক যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। না পৌঁছাবো ইউরোপ, না ফিরে যেতে পারবো ভারতে। কি হবে তারপর? ওঃ ভগবান! একি চিন্তা-মৃত্যু?

তার মানে বাবা মা ভাইদের আর কখনও দেখতে পাব না? ছোট্ট একটা ভাই হয়েছিল দেবুর পর। নাম পুচনীয়া,—সে বাঁচেনি। জন্মের কয়েকমাস পরে তার মৃত্যু হয়। তেমনিভাবে মৃত্যু আসবে আমার কাছেও এই জাহাজে?

গুলাবকে মনে পড়লো। ঝালাওয়াড়ের এক অফিসারের মেয়ে গুলাব। আমারই বয়সি হবে। পারিবারিক বন্ধুত্বের খাতিরে ও প্রায়ই আসতো ওর মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের কাছে। বম্বে থেকে ছুটিতে বাড়ি এলে মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হতো। গুলাব বাড়ির মেয়ের মতই হয়ে গিয়েছিল। আমিও সহজভাবেই বোনের মত নিয়েছিলাম ওকে! ওরা চলে যাবার সময় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া ও বিদায় অভিবাদন জানান এ অতি সাধারণ ভদ্রতা ছিল আমার পক্ষ থেকে।

একদিন অমনি বিদায় জানাবার সময়ে গাড়িতে উঠার আগে গুলাব আমার সঙ্গে হাঁটছিল। সেদিন ছিল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রি। কথা বলতে বলতে ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। আমার দিকে তাকিয়ে দ্বিধাজড়িত স্বরে বললো, 'আপকো ম্যাঁয় কুছ বলুঙ্গি—মগর বলনে সে বহুত শরমাতি হুঁ!'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আরে ক্যায়া হ্যায়, বোলো!' তখন পর্যন্ত আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ও কী বলতে পারে। কিন্তু ওর আচরণে আশ্চর্য হয়েছিলাম সন্দেহ নাই। গুলাব ধীরে-ধীরে মাথা নামিয়ে বললে, 'ম্যাঁয় আপকো মহব্বৎ করতি হুঁ। লেকিন হামকো এ্যায়সা লাগতি হ্যায় যায়সে হমলোগ কভি নেহি মিলুঙ্গি।'

এতটা বলে ও আমার দিকে তাকাল। ওর দু'চোখ জলে ভরে গেছে।

ওর কথা শুনে যেমন আশ্চর্য হয়েছিলাম তেমনি আনন্দও পেয়েছিলাম। এর আগে গুলাবকে কতবার দেখেছি, কত গল্প করেছি। কিন্তু এমনি ভাবে কখনও ভাবিনি। অথচ কি আশ্চর্য, গুলাব আমাকে ভালবাসে।

ওর ব্যথাভরা করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনটাও হঠাৎ সহানুভূতি ও বেদনায় ভরে গেল।—বেচারি গুলাব! কি জবাব দেব ওর কথার? বললাম, 'আয়সা ম্যাৎ শোচ! হম্ হর ছুটিমে আউঙ্গা। তুমসে মিলুঙ্গা জরুর মিলুঙ্গা!'

ও কেমন একটা করুণ-হাসি হেসে গাড়িতে গিয়ে বসলো।

তার কিছুদিন পরেই ছুটির শেষে বোম্বাই ফিরে যাই। গুলাবকে ভুলিনি। ক্লাস ও বন্ধু-বান্ধবে ভরা ব্যস্ত জীবনে গুলাব নিয়ে আসতো একটা স্নিগ্ধ পরশ। অবশেষে আবার এল ছুটি—বাড়িতে এলাম ঝালাওয়াড়ে। কথায় কথায় মার কাছ থেকে জানতে পারলাম কি এক কঠিন অসুখে ভুগে হঠাৎই মারা গেছে গুলাব!

কি করে হতে পারে? বেচারি গুলাব! একটা অতৃপ্তি নিয়ে, একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ও চলে গেল। যদি মারা যাবার আগে আর একবারও দেখতে পেতাম—!

আমার জন্য বলছি না। কিন্তু ও হয়ত একটু সান্ত্বনা পেতো। 'ম্যাঁয় আপকো মহব্বৎ করতি হুঁ, লেকিন এ্যায়সা লাগতি হ্যায় যায়সা হমলোগ কভি নেহি মিলুঙ্গি!' গুলাবের এই কথাগুলো বারে-বারে মনে পড়ে যাচ্ছিল, আর আমার চোখেও জল এসেছিল। কোন রকমে চোখের জল লুকিয়ে সেদিন মায়ের সামনে থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলাম। গুলাব, তুমি চলে গেছ! আজ তোমাকে বারে-বারে মনে পড়ছে! সমুদ্রের অতল কালো জলের মরণডাকের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে বারে-বারে তোমাকে মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে—তুমিও যেন ডাকছ তোমার কাছে যেতে।

গুলাবের কথা, পুচনীয়ার মৃত্যু, মায়ের কথা—এসব আমার করুণ স্মৃতি। কিন্তু

জাহাজে মৃত্যুর মুখোমুখি একলা-একলা নিজের মনে সেই করুণ ছবিই কি অদ্ভুত স্নিগ্ধ-মধুর পরশ দিয়ে যাচ্ছিল।

মার কথা বড় স্পষ্ট মনে আছে। আমার দৌড়াত্ম্যকে কিভাবে হাসিমুখে সামলাতেন। সময় সময় শাসনও করতেন।—মায়ের সেই শাসনকেও আজ কত মধুর মনে হচ্ছে!

একবার কী নিয়ে জানি মা খুব রাগ করেছিলেন আমার উপর। আমিও সমানে বিরক্ত করছি তাঁকে।—মা বারেবারে ভয় দেখাচ্ছেন মারবেন বলে। শেষে সত্যি-সত্যি অতিষ্ঠ হয়ে মারতে এলেন আমাকে। আমিও দিলাম দৌড়। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাতে গেলাম। ওমা, দেখি মাও পিছনে-পিছনে এসেছেন ছাতে। আমি নিরুপায় হয়ে ছাদের কিনারে গিয়ে বললাম, 'যদি ধর তো লাফ দিয়ে নিচে পড়ব।'

মা ভালভাবেই জানেন ওখান থেকে লাফিয়ে পড়া সম্ভব নয়। তাই কাছে এসে ধরে ফেলে বললেন, 'খুব বীরত্ব দেখানো হচ্ছে, না? কই লাফা দেখি-লাফা।' বলে মৃদু-মৃদু ঠেলা দিতে লাগলেন। আমি ভয়ে চীৎকার করছি, -'আর করবো না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলে।'

মা ছাড়লেন কিন্তু আমার মাথায় একটা মতলব ঢুকলো। মাকে জব্দ করতে হবে।

ছাদের যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক তার নিচে বাগান-এর মাটি-আমাদের মালীর কাছ থেকে কোদাল নিয়ে সেখানটা ভাল করে কোপালাম। কাঁকর-টাকর বেছে সুন্দর ঝুরঝুরে করে রাখলাম। এরপর চলল আমার লাফান প্র্যাকটিস করা। প্রথমে গেটের উপর থেকে, তারপর পাঁচিল থেকে। তারপর কার্নিশ থেকে,—এমনি করে যখন প্রায় একতলা থেকে লাফাতে পারলাম, সেদিন নিশ্চিন্ত হলাম। এসব করতে প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন কেটে গেল। তারপর সুযোগের অপেক্ষা। শেষে আবার একদিন অমনিভাবে কোন কারণে বিরক্ত করে ছাদে পালালাম। মাও এলেন পিছু-পিছু। সেবারের মত এবারও লাফিয়ে পড়ব বলে মাকে ভয় দেখালাম। মা ভাবলেন, মিছিমিছি বলছি। কেননা, মাত আর জানেন না আমার কীর্তি। তাই যেই আমাকে ধরতে এলেন অমনি আমিও ঝুপ করে দিলাম লাফ! পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম মায়ের আর্তনাদ। মা কল্পনাও করেননি যে, আমি লাফ দেব। মায়ের আতঙ্কিত চীৎকার শুনতে পাচ্ছি—'ওরে কে আছিস, শিগগির যা, খোকার বোধ হয় হাত-পা সব ভেঙে গেল! আমার ছেলেটি বুঝি গেল।'

লোকজন আসছে বুঝতে পেরে ওখান থেকে দৌড়—কি মজা! মাকে জব্দ করতে পেরেছি। সে-সময়ে আমার বয়স বছর দশেক হবে, কিংবা এগারোও হতে পারে।

যাইহোক, কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে আসতেই মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না! 'কোথায় লেগেছে রে খোকা? আর কখনও তোকে মারবো না!' এমনি সব কথা বলে আমায় আদর করছেন। তখন আমি মাকে বললাম আমার দুষ্টুমির কথা। শুনতে-শুনতে মায়ের কান্না ভেজা মুখে ধীরে-ধীরে হাসি ফুটতে লাগলো। আর আমার বলা শেষ হতেই হাসতে-হাসতে গালে বেশ জোরেই মিষ্টি একটা চড় মারলেন। আমিও হেসে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।

সর্বদা হাসিখুশি মা আমাদের। তবুও মাঝে মাঝে কেমন যেন উদাস হয়ে যেতেন! পরিষ্কার বুঝতে পারতাম লুকিয়ে লুকিয়ে মা কাঁদছেন। মনের মধ্যে কোন ব্যথা যেন তিনি চেপে রাখতে চাইছেন। তখন বুঝতে পারতাম না সেটা ঠিক কি?

বাবা বাইরে-বাইরে থাকতেন। একবার তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাবা বিলেতে আট্‌কা পড়ে যান। কোন খবর নেই তাঁর। এদিকে আমাদের দিন কাটে দুশ্চিন্তায়।

এসব কারণেও মা মাঝে মাঝে মনমরা হয়ে পড়তেন।

আমি সেবার বাবার সঙ্গে একলা ঝালাওয়াড়ে ছিলাম। সেবার হঠাৎ শুনলাম বাড়িতে অতিথি আসবেন এক ওয়েলিশ মহিলা। সারা বাড়ি রং করা হোল। দামি-দামি কার্পেট, সুন্দর ফার্নিচার, নতুন-নতুন জিনিসে ভরে গেল বাড়ি। উৎসবের সাড়া পড়ে গেল বাড়িময়। —বাবা খুব ব্যস্ত। চাকর-বাকর সব তটস্থ! আর আমার মনে কৌতূহল। যথা-সময়ে নির্দিষ্ট দিনে এলেন বিদেশিনী—অতিথি। তাঁর নাম ব্র্যান্ডা (বৃন্দা)। আমার সঙ্গে আলাপ হোল। বৃন্দা আমাকে খুব ভালবেসে ফেললেন। ওঁর কাছে ধীরে-ধীরে আমি অনেক কিছু শিখতে পারলাম। অনেক সুন্দর অভ্যাস, অনেক সুন্দর ম্যানারস্‌ আমাকে শিখিয়েছিলেন তিনি।

এর কিছুদিন পরে বাবা তাঁর এই মহিলা-বন্ধু শ্রীমতী বৃন্দার সঙ্গে আমাকে কাশ্মীরে পাঠান। মা এতে আপত্তি করেন নি। তবে খুব খুশি হননি। দিল্লি, কাশ্মীর, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, জয়পুর, উদয়পুর, এই সব ঘুরে আমরা ফিরলাম ঝালাওয়াড়ে। দিল্লি বৃন্দার খুব ভাল লাগে।

সে-সময়ই জানতে পারলাম যুদ্ধের সময় যে বাবা বিলেতে আটকে পড়েন, সে-সময়টা বাবার খুব কষ্টে কাটে। হাতে পয়সা-কড়ি ছিল না। দু'খানা বই তিনি লেখেন সে-সময়। একটি ভগবান বুদ্ধের কাহিনী—লাইট অব এশিয়া ও অপরটি ইন্ডিয়ান উইট অ্যান্ড হিউমার। তাছাড়া কাগজে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধেও কিছু লেখা তিনি লেখেন। এইভাবে বাবার দিন চলছিল লন্ডনে। যুদ্ধের জন্য দেশের সঙ্গে অথবা

মহারাজার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। সে-সময়ই শ্রীমতী বৃন্দার সঙ্গে পরিচয় হয় বাবার। বাবা এঁদের বাড়িতেই পেইং গেস্ট হিসাবে থাকতেন। বাবা সেখানে হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন দীর্ঘদিন অক্লান্ত সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন এই মহিলাটি, অর্থাৎ শ্রীমতী বৃন্দা। সেই সেবার মধ্য দিয় গড়ে ওঠে তাঁর ও বাবার মধ্যে এক গভীর বন্ধুত্ব, যেটা পরিণত হয় ভালবাসায়। এবং সেই ভালবাসার টানেই নিজের দেশ ত্যাগ করে বৃন্দা চলে এসেছিলেন ভারতে।

যাই হোক, ঝালাওয়াড়ে ফিরে এসেই আমি চলে যাই বোম্বাইয়ের আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে। প্রথম ছুটিতে গেলাম বাড়ী—মা তখন কাশীতে ছিলেন। রাজু, দেবু, ভূপেন সবাই কাশীতে। শুধু বাবা ঝালাওয়াড়ে। সেই সময় মা আর মামাবাড়িতে ছিলেন না, ছিলেন বাঙালিটোলায় এক নিজস্ব বাড়িতে।

বাড়িতে পা দিয়েই মায়ের চেহারা দেখে অবাক লাগল।—পরে শুনলাম-বাবা নাকি বিবাহ করেছেন বৃন্দাকে হিন্দুমতে। মহারাজাও নাকি যথেষ্ট সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন এ ব্যাপারে!

ভাইরা এ ব্যাপারে খুব অসন্তুষ্ট। কিন্তু কেন, তা বোধ হয় জানত না। আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগল। তলিয়ে ঠিক বুঝতে পারলাম না, কি কারণ। আমরা সবাই তখন ছেলেমানুষ। আমার সতেরো, আর ওদের আরও কম। তবে মাকে দেখে বড় কষ্ট হয়েছিল সেদিন।

ধারাবাহিক

নির্বাচনের অন্য গল্প

শুভাশিস মৈত্র

সাপ্তাহিক কাগজের লড়াই দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে। প্রতিদিনকার যাবতীয় খবর শুষে নেয় এই সব বাংলা-ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার লক্ষ লক্ষ কপি। সাপ্তাহিক পত্রিকার রিপোর্টারদের কাজ, এই সংবাদশূন্য পরিমন্ডল থেকে তুলে আনা উজ্জ্বল টাটকা সংবাদ, দৈনিক পত্রিকার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যার কোন হদিশই পায়নি। অর্থাৎ এক্সক্লুসিভ স্টোরি।

নির্বাচন যেদিন হল, আমাদের সংগ্রহ করা সমস্ত খবরই প্রকাশিত হয়ে গেল পরের দিনের নানান খবরের কাগজে। অর্থাৎ কোন এক্সক্লুসিভ স্টোরি নেই। সারাদিনের সমস্ত পরিশ্রম এভাবে মাঠে মারা যাবে আশা করিনি। এরকম সময় মনে পড়ল যাদবপুরের সেই বাচ্চা মেয়েটার কথা। সবে কথা বলতে শিখেছে। এক হাতে কমলা লেবু। বাবার সঙ্গে এসেছে ভোট দেখতে। লম্বা লাইনে ছোট্ট দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। পাশে ফুট ফুটে মেয়েটি। মেয়েটি ইতি উতি চাইছে আর যারই চোখ পড়ছে ওর উপর তাকেই ও হাত তুলে ছোট্ট হাতের পাতাখুলে হেসে হেসে বলছে 'হাতে দিও কিন্তু....।' নিঃসন্দেহে ওর বাবাটিও হাতেই ছাপ দেবেন। আর এমন একটি গোপন ব্যাপার জানাজানি হয়ে যাচ্ছে দেখে ভদ্রলোক ওকে মাঝেমাঝে থামাতে চাইছেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে। রাস্তায় শুনলাম যাদবপুরে রিগিং চলছে। তাড়াতাড়ি আমরা চলে এলাম মমতা ব্যানার্জির ঝিলরোডের নির্বাচনী অফিসে। সেখানে কংগ্রেসী নেতা রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানালেন দু'একটি ফলস্ ভোটের চেষ্টা নাকি তাঁরা বানচাল করে দিয়েছেন ফাল্গুণী সংঘের বুথে, তবে রিগিং-এর কোন খবর তিনি শোনেননি। পাশেই ছিল সোমনাথ বাবুর নির্বাচনী অফিস। সেখানে তরুণ কর্মী গৌতম ভৌমিক জানালেন রিগিং টিগিং হচ্ছেনা তবে সোমনাথবাবুর জয় নিয়ে তাঁর সন্দেহ আছে। এটুকু বলার পরই পাশ থেকে একজন তাকে প্রচন্ড ধমক দিলেন। 'যা জাননা বোঝনা তাই নিয়ে কথা বলছ কেন', এর পরই আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে জানতে চাইলেন আমি কি জানতে চাই। কোন রিগিং-এর খবর যোগাড় করা সম্ভব হলনা। ঝিলরোড থেকে দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন। মাঝে অন্নপূর্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কিছুক্ষণ সময় দাঁড়ালাম দু'জায়গাতেই বামফ্রন্ট আর কংগ্রেস কর্মীরা পাশাপাশি অফিস খুলে বসে আছেন। কোথাও কোন বিদ্বেষের লেশ মাত্র নেই। কোন অভিযোগ নেই। প্রায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ

পরেশ চন্দ্র তালুকদার বাঘাযতীনের কংগ্রেস অফিস থেকে জানালেন কোন রিগিং বা কোন টেনসনের গল্প তাঁর জানা নেই। চারদিকে কেমন একটা মেলার ভাব এসে গেছে ততক্ষণে। রোদে পিঠ দিয়ে জায়গায় জায়গায় আড্ডার জটলা। চানা বাদাম ওয়ালারা এসে বসেছে বুথের আশেপাশে। এখান থেকে একটি অদ্ভুত সংবাদ আমরা সংগ্রহ করলাম। বামফ্রন্টের এক কর্মী জানালেন তাদের পাড়ায় একটি বাড়িতে ভোট নিয়ে তুমুল দাম্পত্য কলহ ঘটে গেছে। স্ত্রী হাতের পক্ষে এবং ভদ্রলোক কাস্তে হাতুড়ি। আগের দিন রাত থেকেই ভদ্রলোক স্ত্রীকে নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। স্ত্রী নাচার। সকালে ভদ্রলোক স্ত্রীকে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে নিজে গেছেন কাস্তে হাতুড়িতে ছাপ মারতে। এই সুযোগে স্ত্রী জানলা দিয়ে হাঁক-ডাক করে লোকজড়ো করে ফেলেছেন। অনেকেই প্রতিবাদ জানালেন এমন অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে ভোটপর্ব সেরে বাবুটিও ফিরেছেন। চাপে পড়ে খুলে দিতে হল তালা-চাবি। সাজগোজ করে স্ত্রী এবারে চললেন হাত চিহ্নে ছাপ মারতে।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ভেতরেও ছিল একটি বুথ। সেখানে কংগ্রেস-বামফ্রন্ট দু'পক্ষই পতাকা লাগান রিক্সায় লোকজন আনছে প্রায় বুথের দরজা পর্যন্ত। বেআইনী কাজ। ফট্‌ফট্ করে ছবি তুলে নিচ্ছেন আমাদের ফোটগ্রাফার কবীর আইচ। এখানেই একজনকে চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম, 'আরে! চন্দন বণিকও দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা সত্যি দেবযানী হত্যার আসামী চন্দন বাবু এবারে জনগণের কাছে ভোটপ্রার্থী। সৌজন্যতা বোধের কতটা অভাব থাকলে এ ঘটনা ঘটতে পারে পাঠক বিবেচনা করুন। অবশ্য এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এক মহিলারও দেখা হয়েছে, যে চন্দন বাবুকে ভোট দিয়েছেন। তিনি জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একজন জিওলজিস্ট। ভোট ব্যবস্থাকে তিনি মানেন না। এর অর্থহীনতাকে প্রমাণ করতেই তিনি ভোট দিয়েছেন চন্দন বাবুকে।

ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া গেছে উত্তর ভারতের কুলুতে একটি বুথে মাত্র ১টি ভোট পড়েছে। সম্ভবত সেখানে ঐ একজন ছাড়া আর কারোরই, ভোটে আস্থা নেই। কলকাতাতেও বেশ কিছু লোকজন

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

আদর্শগত কারণে সাদা ব্যালট পেপার বাক্সে ফেলেছেন। এর জন্য তাদের কাউকে কাউকে দু'তিন ঘণ্টা লাইনেও দাঁড়াতে হয়েছে। ক'লকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকের এক সাংবাদিক লাইনে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে জানালেন 'সাদা ব্যলট দেব'। অর্থাৎ প্রচুর কষ্ট করে ভোট না দেওয়া।

সারা ভারতেই দাঙ্গা হয়ে গেছে। ফলত দাঙ্গার ফসল কে কোথায় ঘরে তুলবে ভোট যুদ্ধে এ হিসেব সব দলের ঠোঁটের ডগায়। যেমন কলকাতায় বামপন্থীরা এই প্রথম শিখদের ভোট পাচ্ছেন ব্যাপক হারে। ফলে এটা এখন আর খবর নয়। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটি কংগ্রেসের নির্বাচনী অফিসে জনৈক শিখ বাংলা কাগজ পড়ছিলেন। কংগ্রেসী অফিসে শিখ। অবশ্যই খবর। তাড়াহুড়ো করে তোলা হল বেশ কিছু ছবি।

এরপর হাজরা ভবানীপুরে শিখদের মহল্লায় মহল্লায় খোঁজ নেওয়া হল। সব জায়গাতেই অমায়িক হাসি ও অভ্যর্থনা। সব জায়গা থেকেই একটি উত্তর, না, কোথাও কান অসুবিধে হয়নি শিখদের ভোট দিতে। গন অসম্মান জনক ঘটনা ঘটেনি।

হাওড়ায় একটি গার্লস স্কুলের বুথের

পাশের কংগ্রেস অফিসে রিগিং-এর খবর জানতে চাওয়ায়, পাশে বসে থাকা কয়েকজন তরুণের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'আমরা এখানে কং(আই), সি. পি. এম এক সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, না রিগিং হয়নি।' মোটামুটি ভোটের দিনে কলকাতার ছবি ছিল এটাই। বিকেলের দিকে খবর এল দু'একটি ছোট ঝামেলার। তবে এই বিরাট কর্মযজ্ঞের তুলনায় ওটা নগন্য। সাধারণভাবে এটাই বলা যায় নির্ভয়ে ভোট দিয়েছেন ভোটাররা।

রাজাবাজারে একটি বুথে চিৎকার আর ছোটাছুটি পুলিশের ধাক্কাধাক্কির মাঝখানে ঢুকতে দেখি তিনটে বাচ্চা ছেলেকে ধরা হয়েছে ফলস্ ভোট দেওয়ার চেষ্টার অপরাধে। ধরেছেন কংগ্রেসের এজেন্ট। কিন্তু পুলিশ নাকি ওদের অ্যারেস্ট করতে চাইছেন না। আরও জানা গেল, আসাগর, আসলাম আর জিয়াউদ্দিনকে সকালে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে ফলস্ ভোট দেওয়ার অপরাধে। এরা সবাই কংগ্রেসের সমর্থক। কংগ্রেসের এজেন্টের মতে দ্বিতীয় দফায় ধরা পড়া তিনটি বালক সি. পি. এম কে ভোট দিতে এসেছিল। কবীর আইচের ক্যামেরা প্রস্তুত। এমন সময় পুলিশ লেন্সে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ছবি নেওয়ার অর্ডার নেই।' তুমুল বাক বিতন্ডা ঠেলাঠেলি শুরু হল। দেখা গেল আরও এক ফোটগ্রাফার আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এসেছেন একটি উর্দু দৈনিকের তরফ থেকে। আর এই তুলকালাম কান্ডের এক ফাঁকে সেই তিনটি বালক লাগিয়েছে ভোঁদৌড়। অবশ্য কবীরের লেন্স এরই মাঝে তাদের ধরে ফেলেছিল তবে ডাটপাড়ার ফলস্ ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়া এক কিশোরীর পিতা একটি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও, সি.পি.আই(এম) নেতা হওয়া সত্ত্বেও, তাকে একটি রাত লক আপে কাটাতে হয়েছে। বিক্ষুব্ধ লোকজনের চাপে পড়ে পুলিশ বাধ্য হয় তাকে অ্যারেস্ট করতে।

যদিও এবারের ভোটে সব থেকে জনপ্রিয় বাকাটি হল, হরলিক্স এর বিজ্ঞাপন অনুকরণে', আমি কেন ভোট দেই! দারুণ লাগে!' এবং, 'আমিতো এমনি এমনি ভোট দেই।' □

ভোটঃ নাগরিকতার অধিকার

চুরি করে ভোট দিতে এসে ধরা পড়া চার বালক

সংবাদ-সাহিত্য

কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা, কামরূপ হইতে দ্বারকা –– এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক মানচিত্রে ইংরাজী বর্ষশেষে কি যেন এক জাদুমন্ত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। অট্ট ও কাষ্ঠ যথাক্রমে এই দ্বিবিধ প্রকার হাসি এখন ভারতরাষ্ট্রের শাসক এবং নাশক দুই দলের নেতাদের মুখে শোভমান। শাসকের মুখে অট্ট, নাশকের মুখে কাষ্ঠ হাসি দেখিয়া আমাদের মুখেও বক্র হাস্য ফুটিয়া উঠিতেছে। ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ,জনতা পার্টির নেতা চন্দ্রশেখর এবং অন্যান্য কয়েকজন নেতা নিজেদের অফিসে স্বর্গত জয়প্রকাশ নারায়ণের ফটোচিত্রের পাদদেশে ম্লানমুখে বসিয়া নির্বাচন-বিপর্যয় সম্পর্কে চিন্তা করিতেছেন। জনগণকে কেহই চিনিতে পারেন নাই –– না কংগ্রেস না বিরোধীপক্ষ। প্রতি পাঁচ বছরে দুই চারিদিন বাদে বাকি সময়টা ইঁহারা জনগণের নিকট হইতে সহস্র যোজন দূরে বিরাজ করেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের হৃদয়ের হদিস কদাচ পাইবেন না।

নাগেরবাজার, সখেরবাজার, শ্যামবাজার, জগুবাজার, টেরিটিবাজার, আনন্দবাজার সব অঞ্চল ঘুরিয়া যাহা সংবাদ পাইতেছি তাহার সারমর্ম কিন্তু নৈরাশ্যজনক।ভাল মন্দ, সাধু-জুয়াচোর, দাগী-নির্দাগী মিলাইয়া নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবারে মন্ত্রী-সভা গঠন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থের দ্বারা শাস্ত্রমতে যে তালিকা প্রস্তুত হইতে পারিত কোনও অজ্ঞাত কারণে শ্রীরাজীব গান্ধী কাস্ত্রোমতে চলিয়া তাহা করেন নাই অথবা করিতে পারেন নাই। মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহার জবাবদিহির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখিতেছি বিরোধী দলকে প্রায় বিপর্যস্ত করিয়া কংগ্রেস বিগত দিনের তুলনায় অনেক বেশি সাফল্য লাভ করিয়াছে –– দিল্লি হইতে আগত, অর্ধনারীশ্বরণের দয়ায় প্রায় অর্ধেক বলা চলে। কিন্তু পূর্ণনারীশ্বরণ না হওয়ার দরুণ অর্ধেক লোকসানও হইয়াছে। দেবদেবীর ব্যাপার লইয়া রসিকতা না করাই ভাল, কিন্তু শ্রীযুক্ত গণি খান ও শ্রীযুক্ত প্রণব মুখোপাধ্যায় মন্ত্রী-সভা হইতে বাদ পড়ায় আমাদের অর্ধেক লোকসান তো হইয়াছেই, আমরা অপমানিত বোধ করিতেছি।

প্রণববাবুর কথা বলিতে পারি না, কিন্তু শ্রীযুক্ত গণি খান সম্পর্কে যাহা শুনিতেছি তাহাতে আমাদের হৃদয় বিগলিত হইতেছে। নির্বাচন-ফলাফল ঘোষণার পর এবং মন্ত্রী-সভা গঠনের পূর্বে খানসাহেব নাকি মালদহ হইতে স্বধর্ম অনুযায়ী সেলুনে কলিকাতা এবং পরধর্ম আশ্রয়ান্তে বিমানে রাজধানী যাইবার পরই ফাটা বেলুনের মত চুপসাইয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুর পর শ্রীপ্রণব ও সম্ভবত শ্রীগণিও তাঁহাদের শোকোচ্ছ্বাসে ইন্দিরা গান্ধীকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে ভ্রাতৃবধ বা ভ্রাতৃলাঞ্ছনা ইতিপূর্বে ঘটিয়াছে –– দিল্লির তখ্‌ত-ই-তাউসের এমনই মহিমা যে এবারেও তাহার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

প্রধানতঃ কৃষক এবং লেখকের দেশ –– আপাততঃ যাহাকে পশ্চিমবঙ্গ বলা হয় তাহার প্রতি কেন্দ্রের এই উপেক্ষার মনোভাব আমরা বরদাস্ত করিতে পারিতেছি না। প্রণববাবুর কথা এখন মুলতবী রাখিয়া শ্রীগণি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য –– তাঁহার অভাবে ভাগীরথী হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রকৃতই বিপদগ্রস্ত হইবে। চক্রের আবর্তন স্তব্ধ এবং পাতাল হাসপাতালে পরিণত হইতে পারে ইহা আমাদের আশঙ্কা। প্রাক্তন পাইলট শ্রীরাজীব বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইয়া রেল-চালক শ্রীগণিকে অনাদর করিলেন। স্টিভেনশন অপেক্ষা রাইটের ক্ষমতা যে অনেক বেশি তাহাই প্রমাণিত হইল। □